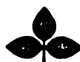
বাড়ি বদলে যায়

রমাপদ চৌধুরী





আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৮

প্রচ্ছদ সুধীর মৈত্র

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডেব পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১৪·০০

সহধর্মিণী
সুষমা চৌধুরীকে
বাড়ির বদলে

এই লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস সমগ্র ১
গল্প সমগ্র
ছাদ ● বাহিরি ● অভিমন্যু ● স্বজন ● বীজ
রূপ ● চড়াই ● হৃদয় ● লজ্জা ● খাবিজ
বনপলাশির পদাবলী
এখনই ● পিকনিক ● এই পৃথিবী পান্থনিবাস
প্রথম প্রহর ● দ্বীপের নাম টিয়ারঙ
লালবাঈ

ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা

১

ধ্রুবর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো। অথচ ওর সঙ্গে এ ব্যাপারটার কি সম্পর্ক ! একজন অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ। ভদ্রলোকের মুখ ও কোনদিন দেখেছে কিনা জানে না। ভদ্রলোক যে এ পাড়ায় ছিলেন তাও জানতো না, এবং জানার কোনদিন প্রয়োজনও হয় নি। হয়তো এই মুহূর্তে ওঁকে দেখতে পেলে মনে পড়তো কোনদিন আসা-যাওয়ার পথে দেখেছে কিনা। হতে পারে এই রাস্তায়, কিংবা দোকানে-বাজারে ওঁকে প্রায়ই দেখতে পেত। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সকলেই আছে, শুধু ভদ্রলোক নেই। থাকলেও বোধহয় চিনতে পারতো না, কারণ ধ্রুব হাঁটাচলার পথে চোখ তুলে বড় একটা কারও মুখের দিকে তাকায় না। লোকজনকে এড়িয়ে চলাই ওর চরিত্র। পাড়ার কেউ ডেকে দু'একটা কথা বলতে চাইলেও হ্যাঁ না গোছের ক্ষুদ্র বাক্যে ভদ্রতা সারে, বড় জোর মুখে একটু স্মিত হাসি। ওটুকুও বানানো সৌজন্য। আসলে মানুষকে এড়িয়ে চলাই ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, অথচ লোকে ভাবে এটা ওর অহঙ্কার। ধ্রুব নিজের মনেই হাসে, যখন আত্মীয়স্বজন কেউ এসে তেমন একটা অভিযোগ করে। কি নিয়ে অহঙ্কার করবে ও, কি আছে অহঙ্কৃত হবার মত।

লোকটির কোন পরিচয়ই যে জানতো না, তাও এই স্বভাবের দোষে।

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে ধ্রুব হনহন করে বাড়ি ফিরছিল, কিছুটা দেরি হয়ে গেছে বলে, কিছুটা চড়া রোদ্দুরের জন্যে। এই গলি দিয়ে এলে পথ অনেকখানি সংক্ষেপ করা যায়, তাই এদিক দিয়েই ওর যাতায়াত। বাস থেকে নেমে বকুলবাগানের বাড়িতে পৌঁছতে সময়ও লাগে, অনেকখানি হাঁটতেও হয়।

হনহন করে হেঁটেই আসছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। নিছক কৌতূহল ছাড়া তখন আর কিছুই ছিল না। শুধু পথচারী দু'একজনের

মুখের দিকে তাকালো, তাদের চোখেও কৌতূহল।

ডানদিক থেকে আরেকটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে, সেটুকু পার হওয়ার সময়েই ওর হঠাৎ চোখে পড়লো। সামান্য কিছু লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তা দেখে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ার মানুষ ও নয়। কোলকাতার রাস্তাঘাটে জটলা তো লেগেই আছে, সেসব দেখে সারস পক্ষীটির মত গলা বাড়িয়ে রহস্যের হদিস পাবার চেষ্টা করে না ধ্রুব। ও বরং এসব এড়িয়েই যায়। কিন্তু ওকেও থমকে দাঁড়াতে হল।

চুম্বকের মত একটা আকর্ষণে ও এগিয়ে গেল। কারণ দৃশ্যটার দিকে চোখ পড়তেই ওর বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠেছে। আকস্মিক কোন ভয় যেন মুহূর্তে ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

দ্রুত পায়ে ও সেদিকে এগিয়ে গেল।

এ রাস্তায় ফুটপাথ নেই বললেই চলে, তবে রাস্তাটা গলির মত নিতান্ত সরু নয়। তারই অর্ধেক জুড়ে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে একটি সংসারের যাবতীয় আসবাব। কেউ যেন ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে বের করে দিয়েছে।

খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবল, বুক কেস। ত্রিভঙ্গ হয়ে পড়ে আছে নারকেল ছোবড়ার পুরু গদি। আর চারপাশ ঘিরে বালতি, মগ, হাঁড়িকুড়ি, রাশি রাশি মসলাপাতির কৌটো। একটা পুরোনো টিন টলে পড়েছে, তা থেকে গড়িয়ে পড়ছে সরষের তেল। একজন কে গিয়ে সেটা সোজা করে বসিয়ে দিল।

ধ্রুব ততক্ষণে ভিড়ের ফাঁকে উঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওর বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠলো। নিজেরই মনে হ'ল ওর মুখ কি এক অজানা আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সেই মুখ অন্যকে দেখাতেও যেন ভয়।

বিস্ময়ের চোখে ও তন্ন তন্ন করে জিনিসগুলোর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছিল। অস্ফুটে বলে উঠলো, ইস্!

এক কোণে একটা তোলা উনোন, কেউ জ্বলন্ত উনোনে জল ঢেলে দিয়েছে। আর তারই আশেপাশে কড়াইয়ে আধ-রান্না কিছু একটা তরিতরকারি, অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িটা কাত হয়ে পড়ে আছে, তা থেকে ভাত গড়িয়ে পড়েছে ফুটপাথে।

একজন কে পিছন থেকে ধ্রুবকে জিগ্যেস করলো, কি হয়েছে মশাই ?

ধ্রুব কোন উত্তর দিল না। প্রশ্নটা তো ওরও।

পাশেই প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকানো ছেলেটি, বলে উঠলো, শালা ছোটলোক, রান্না ভাতটুকুও খেতে দেয় নি।

আরেকজন ও প্রান্ত থেকে বললে, কি অবস্থা বেচারিদের !

তার গলার স্বরে বিষণ্ণতা মাখানো।

ততক্ষণে ধ্রুবর চোখ পড়লো বেশ কিছুটা দূরে একজন ভদ্রমহিলা, সঙ্গে দুটি বাচ্চা ছেলে, একটি ফ্রক পরা মেয়ে। ওরা সকলেই অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। ভদ্রমহিলা মুখ নিচু করে আছেন, লজ্জায়। পাড়ার এত লোকের সামনে এমনভাবে অপদস্থ হওয়ার লজ্জা ? কিংবা কে জানে, এখন তো ওঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, হয়তো লজ্জা-অপমানের বোধটুকুও আর নেই।

ব্যাপারটা কি, বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকানো ছেলেটি হঠাৎ বললে, ভদ্রলোক গেলেন কোথায় ?

ওপাশের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বৃদ্ধ লোকটি জবাব দিলেন, শুনছি তিনি তো সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে গেছেন। হয়তো কোর্টে।

হাতে ব্রীফ কেস ঝোলানো কাঁচাপাকা চুলের লোকটি বললে, কোর্টে গিয়ে আর এখন কি হবে, হয়তো কোন আস্তানার খোঁজে।

না, ধ্রুব একজনও চেনা লোক দেখতে পেল না। শেষে ঐ ব্রীফ কেস হাতে লোকটিকেই জিগ্যেস করলো, কি হয়েছে ? জানেন কিছু ?

লোকটি ভারি ব্রীফ কেস হাতে ঝুলিয়েও কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে, দেখে বুঝতে পারছেন না ? ইজেক্টমেন্ট। ভাড়াটে উচ্ছেদ।

বুঝতে যে পারছিল না, তা নয়। তবু কথাটা যেন শুনতে চাইছিল না। অন্য কিছু শুনতে পেলে খুশি হত। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর কথাটাই শুনতে হল। ইজেক্টমেন্ট।

একজন অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ, সে লোকটির মুখও দেখে নি ধ্রুব, কেমন চরিত্রের মানুষ, ভাল না মন্দ, কিছুই জানে না, তবু ওর বুকের মধ্যে আধখানা জুড়ে যেখানে আতঙ্ক শিকড় গেড়েছে, তারই পাশে অসহায় অচেনা মানুষটির জন্যে সমবেদনা উথলে উঠলো।

ধ্রুব ধীরে ধীরে বললে, ওঁদের কেউ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসতে দিলেও তো পারতো।

ধুতি পাঞ্জাবি পরা বৃদ্ধের কানে গেল কথাটা। তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলেন, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসতে দে'ব ? পাড়ার কেউ আসেনি মশাই, কেউ আসেনি। শুধু দোতলা তিনতলা থেকে উঁকি দিয়েই সরে যাচ্ছে।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকানো ছেলেটি প্রতিবাদ করলো। —পাশের বাড়ির লোক তো ডাকতে এসেছিল, ওঁরাই যান নি।

ঠিক তখনই দেখা গেল, একটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বছর আঠারো কুড়ির একটি মেয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়ানো ভদ্রমহিলার কাছে গেল। কিছু বললো। হাত ধরে ডাকলো। ভদ্রমহিলা প্রথমটা না না করে শেষে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তার সঙ্গে চলে গেলেন।

ওঁরা চলে যেতেই রাস্তায় পড়ে থাকা খাট, আলমারি, বুককেস, জল ঢালা তোলা উনোন, ভাত গড়িয়ে পড়া অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি রাস্তার একপাশে বিস্ময়ের, আতঙ্কের একটা বিশাল প্রশ্নচিহ্ন হয়ে পড়ে রইলো।

একে একে সকলেই চলে যাচ্ছিল। ধ্রুব দেখলো, ওরা কেউই পাড়ার লোক নয়। ধ্রুবর মতই পথ দিয়ে যেতে যেতে হয়তো দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ধ্রুবও চলে এলো। কিন্তু দৃশ্যটা মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারলো না।

লোকটি অচেনা। সরল নিরপরাধ শান্তশিষ্ট সংসারী মানুষ, না জটিল ধুরন্ধর প্রকৃতির, তাও জানে না ও। তবু, নিজেরই অজান্তে কি ভাবে যেন অদেখা মানুষটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

পাড়ার কেউ এগিয়ে আসে নি। এসে থাকলেও দু'একজন। অথচ কেন ? মানুষটি যত খারাপই হোক, এই দুঃসময়ে দুটো মুখের কথার সমবেদনা জানাবে না ? বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে দুদণ্ড বসতে দেবে না ? এই কৌতূহলী জনতার চোখের সামনে উপহাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ?

ধ্রুব কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না। এটা যদি ধ্রুবরই পাড়ার ঘটনা হত, ও কি এগিয়ে যেত ? বলতো, আসুন আমাদের বাড়িতে ? ছেলেমেয়েদের বলতো, এসো। তোমাদের বাবা যতক্ষণ না ফিরে আসেন···

ধ্রুব বুঝতে পারলো না।

এখন তো পাড়ার মধ্যে এরা অচ্ছ্যুৎ হয়ে গেছে। লাঞ্ছিত, অপমানিত একটি মানুষের সঙ্গ থেকে সকলেই দূরে সরে থাকতে চায়। পাছে তার গায়েও সেই অপমানের ছিটে লাগে। না কি ভয় ? এ রাস্তার বেশির ভাগই তো ভাড়াটে . দোতলা তিনতলা বাড়ির সারি। বাড়িওয়ালা ওপরে থাকেন। নীচের একতলা দোতলা ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়াটেরা একা একা বাড়িওয়ালাকে তোয়াজ করে চলার চেষ্টা করে। উচ্ছেদ হওয়া ভাড়াটের পাশে এসে দাঁড়ালে বাড়িওয়ালা রুষ্ট হবে সেই ভয় থেকেই কি কেউ এসে দাঁড়ায় নি।

অসম্ভব। বাড়িওয়ালাকে আজকাল কেউ এত ভয় পায় নাকি ?

আসলে তা নয়। ভদ্রমহিলাই হয়তো যেতে চান নি। ওঁর সর্বাঙ্গে তো এখন অসীম লজ্জা। দু'দিন আগে যাদের সঙ্গে হেসে কথা বলেছেন, তাদের চোখের সামনে এই দৃশ্য। উনি চোখ তুলে তাদের দিকে তাকাবেন কি করে ! সেজন্যেই যেতে চান নি। কেউ আর এগিয়েও আসে নি। শেষে রাস্তার লোকের ভিড় থেকে পালাবার জন্যেই মেয়েটির সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছেন।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ধ্রুব এইসব কথাই ভাবছিল। ওর হঠাৎ মনে হ'ল, কি আশ্চর্য। লজ্জা কি শুধু ঐ ভদ্রমহিলার ? আমিও তো লজ্জিত অপমানিত বোধ করছি। আমাদের রাস্তায় এ-ঘটনা ঘটলে এ অপমান আমাকে আরো বেশি করে স্পর্শ করতো। আমি রাস্তায় বেরিয়ে এসে ওদের কাছে যেতে পারতাম না। কেবলই মনে হত তিনতলার ব্যালকনিতে দাঁড়ানো বাড়িওয়ালার খুশি খুশি উপহাসের দৃষ্টি আমার পিঠের ওপর আছড়ে পড়ছে। এ তো প্রতিটি ভাড়াটের লজ্জা।

ধ্রুবর নিজেরই খুব অবাক লাগছিল। বাড়িওয়ালার সঙ্গে তো ওর এখনও মৌখিক সদ্ভাব আছে। অথচ ও এখন আলাদা মানুষ হয়ে যাচ্ছে কি করে ! এই মুহূর্তে বাড়িওয়ালা মানুষটিকে ধ্রুব ওর বিপরীত দিকে দেখতে পাচ্ছে কেন !

সব দিক থেকে ওরা মিলেমিশে একই মানুষ। কোন তফাত নেই। শুধু একজনের বাড়ি আছে, আরেকজনের নেই। শুধু সেজন্যেই ওরা আলাদা মানুষ হয়ে যাবে ?

বকুলবাগানের এই বাড়িতে ঢোকার সময় অজান্তেই ওর চোখ চলে

যায় ওপাশের তেতলার বারান্দায়। কেউ সেখানে না থাকলে নিশ্চিন্ত।

আসলে ধ্রুবরা এদিকের ফ্ল্যাটে ভাড়া আছে অনেকদিন। ওদিকটায় আরেক ভাড়াটে। বাড়িওয়ালা তো তেতলায়। ইদানীং ভদ্রলোকের সঙ্গে আর তেমন ভাব ভালবাসা নেই। হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে দু'জনের মুখেই মিষ্টি হাসি দেখা যায়, দু'চারটে অন্তরঙ্গ ভনিতা। তারপর ধ্রুবই ব্যস্ততা দেখিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে। কারণ ওর আশঙ্কা, আর কিছুক্ষণ সময় দিলেই রাখালবাবু কথাটা তুলবেন। সঙ্গে সঙ্গে সারাদিনের জন্যে মেজাজ নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্রুব অবশ্য হেসে হেসেই কিছু একটা বলবে, স্তোক দেবে, হয়তো মিথ্যে স্তোক। কিংবা মুহূর্তে রেগে গিয়ে কিছু একটা বলে বসবে। তখন তার আবার কি প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে!

সেজন্যেই ও তেতলার বারান্দার দিকে চোখ তুলে তাকায় না। চোখাচোখি হওয়াকেও ভয়। কতদিন তো রাস্তায় দূর থেকে রাখালবাবুকে আসতে দেখে ও ফুটপাথ পাল্টেছে।

কিন্তু আজ আর শুধু রাখালবাবুকেই ভয় নয়। ভয় প্রীতিকেও।

রাস্তার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া একটা গোটা সংসার, কয়েকটা অভুক্ত মানুষের লুকোনো মুখ, ব্যস্, এই দৃশ্যটুকু দেখার পর থেকে ধ্রুবর মনে হচ্ছে ওর যেন হাঁটুতে কোন জোর নেই। নিজেকে কেমন অসহায় লাগছে।

প্রীতির কাছে এ-সব কথা গোপন রাখতে পারবে না। ধ্রুবর যা স্বভাব, কোন কথাই গোপন রাখতে পারে না। অথচ প্রীতিকে এই দৃশ্যটার কথা বললেই, ও জানে, প্রীতির মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হয়ে যাবে।

বাড়িতে ঢুকে ধ্রুব চুপচাপ শার্ট খুললো, প্যান্ট বদলে পাজামা পরলো। কথাটা চেপে রাখার চেষ্টা করছে ও তখনও। যদি না বলে পারা যায়, প্রীতিকে অকারণ ভয় পাইয়ে দিয়ে কি লাভ! কিন্তু না বলেও পারছে না। কোন একজনকে না বলে ফেলতে পারলে ও নিজেই যে হাল্কা হতে পারবে না।

চেয়ারটা বেশ শব্দ করে টানলো, রান্নাঘর থেকে প্রীতি যাতে শুনতে পায়। হয়তো জানেই না, ধ্রুব ফিরে এসেছে।

সকালের দিকে এই সময়টুকু ধ্রুব নিজে যত ব্যস্ত, প্রীতি তার হাজারগুণ। হাতের ঘড়িটা একবার দেখে নিল ধ্রুব।

খুট খাট ঠুং ঠাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। কথাও। কখনও বালতি টানার কিংবা জল ঢালার শব্দ, কখনও হাঁড়ি কড়াই খুন্তির। এ সময় প্রীতির কাজ কি একটা! ঠিকে ঝি একদিকে, অন্যদিকে একজন রান্নার কাজের জন্যে—সুধা, তাদের ওপর নানারকম নির্দেশ দিতে দিতে প্রীতি নিজেও ছোটাছুটি করে কাজ করে। কি কাজ তা অবশ্য ধ্রুব ঠিক জানে না, জানার চেষ্টাও করে না। এ সময়টা সমস্ত বাড়িটার যেন এক জট পাকানো অবস্থা। এসব সময়ে ধ্রুব একটু দূরে সরে থাকতে চায়। এমন কি এক কাপ চায়ের কথা বলতেও দ্বিধা।

চায়ের কথা বলতে হ'ল না। প্রীতির গলা শোনা গেল, সুধা দেখ, বোধহয় দাদাবাবু ফিরেছে, চা করে দে।

অর্থাৎ চেয়ার টানার শব্দটা ওর কানে গেছে।

যথাসময়ে চা এলো, সুধাই নিয়ে এলো।

চা খেতে খেতে খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল ধ্রুব।

প্রীতি ঘরে ঢুকলো কাপড় কাচার গুঁড়ো সাবানের প্যাকেট হাতে নিয়ে। বোধহয় রাখতে এসেছিল।

ধ্রুব কাগজ থেকে চোখ তুলে বললে, মন খারাপ হয়ে গেল আজ, একটা জিনিস দেখে।

কি দেখে এসেছে ও, বলতে গেল।—জানো, আজ রাস্তায়, বিশুর পানের দোকানের পাশের রাস্তায়···

আরো একটু এগিয়েছে, বর্ণনা দিতে শুরু করেছে ও, শুনেই প্রীতি বলে উঠলো, শুনেছি, কাজল বলছিল।

কাজল ঐ ঠিকে ঝিয়ের নাম, ধ্রুব আন্দাজে বুঝে নিল। হয়তো এর আগে শুনেছে, মনে পড়ে গেল। আসলে ঐ নামগুলো তো এক থাকে না, দু'তিন মাস অন্তরই বদলে যায়। এত মনে রাখাও যায় না। যেমন ঐ চব্বিশ ঘণ্টার কাজের লোক সুধা। যাকে দিয়ে প্রীতি এখন রান্না করায়। ও নামটাও কতবার যে বদলে গেছে। র‍্যাশন কার্ডে ওরা সকলেই অবশ্য মীরা···পদবী কি মনে নেই। মান্ধাতা আমলে ঐ নামের কেউ ছিল, সেই নামই চলে আসছে। বার বার নাম বদলানো তো সম্ভব নয়, ধ্রুব হাসতে হাসতে একবার বলেছিল, দু'মাস অন্তর কার্ড বদলাতে গেলে তো মশাই গভর্নমেন্টই গণেশ ওল্টাবে।

ইনস্পেক্টর ভদ্রলোকও হেসে ফেলেছিলেন।

'শুনেছি, কাজল বলছিল।' ব্যস্, ঐটুকু বলেই প্রীতি চলে গেল।

আশ্চর্য, একটা কথা শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, সময় নেই ওর কথা বলার। এতই ব্যস্ত। বলবে তো কি শুনেছে? ঠিকে ঝিরাই তো পাড়ার গেজেট। সত্যিমিথ্যে মিশিয়ে নানারকম গুজব তো ওরাই ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। তিলকে তাল বানায়। কথাটা মনে হতেই ধ্রুব ভাবলো, আমরা ভদ্রলোকরাই বা কম কি। ঐ ভাড়াটে ভদ্রলোককে নিয়ে এতক্ষণে বাড়িতে বাড়িতে কত গুজব রটে গেছে কে জানে!

কিন্তু কাজল কি শুনে এসেছে, কি বলেছে প্রীতিকে তা জানার কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিল না ধ্রুব। এই সব সময়ে ও তাই মাঝে মাঝে প্রীতির ওপর চটে যায়। কাজ তো সকলেই করে, তা বলে দুটো কথা বলার সময় হবে না?

আর কিছুক্ষণ পরে ধ্রুবরও তাড়াহুড়ো। স্নান, খাওয়া, পোশাক বদলানো, এটা ওটার খোঁজ। লেটে অফিস যাওয়া।

অফিস যাওয়া মানে তো বিভীষিকা। যত দেরি হবে, তত ভিড় বাড়বে বাসে! লেটে গেলে তবু কিছুটা স্বস্তি। লেটে, অর্থাৎ সেই বারোটায়।

প্রীতি আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এলো এতক্ষণে। এসেই বেশ রাগত স্বরে বললে, দেখলে তো। ঠাকুমা বলত, গরিবের কথা বাসি না হলে মিষ্টি হয় না।

ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হ'ল না। ও তবু প্রীতির রাগ কমাবার জন্যে হেসে বললে, যাব্বাবা, আমি আবার বড়লোক হয়ে গেলাম কবে থেকে। আর আমি বড়লোক হলে তো তুমিও বড়লোক, গরিব হতে যাবে কোন দুঃখে।

উল্টো কাজ হ'ল। মেয়েরা কাথায় কথায় হাসে ঠিকই, কিন্তু ওদের সেন্স অফ হিউমার কম। ধ্রুবর রসিকতায় হেসে ফেলার বদলে প্রীতি প্রচণ্ড রেগে গেল।

বলে বসলো, দেখবে দেখবে, যেদিন ওদের মতই সব ঘর থেকে টেনে বের করে দেবে, সেদিন বুঝতে পারবে।

ধ্রুবর মুখ নিমেষে চুপসে গেল। এই একটা কথাই তো ও দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছিল। কোথায় সাহস দেবে, বলবে, 'তুলে দেওয়া অত সহজ

নয়, আইন আছে,' তার বদলে....

ধ্রুব প্রতিবাদ করার বা হেসে উড়িয়ে দেবার জোর পেল না। তাই ধীরে ধীরে জিগ্যেস করলো, কাজল কি বলেছে ? কি করে তুলে দিল ?

—কি করে আবার। কাজল বলছিল, ভদ্রলোক নাকি ভীষণ ভালমানুষ, সবাইকে বিশ্বাস করেছিল....

একটু থেমে বেশ রাগের স্বরে আবার বললে, ভালমানুষ হয়েই থাকো। ভালমানুষির আর দিন নেই, বুঝলে !

ধ্রুব আর কোন কৌতূহল দেখায় নি, আর কোন প্রশ্ন করে নি। কৌতূহল দেখিয়েই বা কি লাভ। কাজল তো বাসন মাজার ঠিকে ঝি। ঝি, ঠিকে ঝি বললে প্রীতি অবশ্য চটে যায়। ওর ভাষায় 'কাজের লোক'। এখন বলে কাজল। এর আগেরটা ছিল লক্ষ্মীর মা। ধ্রুবর অতশত নাম মনে থাকে না।

চটি ছিঁড়ে গিয়েছিল বলে প্রীতিকে একদিন বলেছিল, মুচিটা যখন যাবে এদিক দিয়ে, ডেকে দিয়ো তো !

সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে ফিরে তাকিয়েছিল প্রীতি। প্রায় ধমকের সুরে বলেছিল, মুচি আবার কি ? জুতো সারাই বলতে পারো না। বাথরুম পরিষ্কার করতে আসে যে লোকটা, তাকে জমাদারও বলা যাবে না। একদিন বলেছিল, কেন, ওর কি নাম নেই ? রঘুয়া বললেই তো পারো। কথাগুলোর পিছনে যুক্তি আছে, কিন্তু অভ্যাস কি এত সহজে বদলানো যায়। প্রীতিই বা কি করে অভ্যাস বদলে নিল। ওরা, মেয়েরা বোধহয় এসব চটপট পারে।

ধ্রুব শুনতে পেল, ওদিকের বারান্দায় প্রীতি হেসে হেসে কাজলের সঙ্গে কথা বলছে। রান্নার লোক সুধার সঙ্গেও এভাবেই কথা বলে। ওদের কারও সামান্য অসুখবিসুখ হলে কত মিষ্টি মিষ্টি করে খোঁজ খবর নেয়, উপদেশ দেয়, এমন কি দু'চারটে ওষুধের বড়িও।—দেখো কাজল, মনে করে খেয়ো কিন্তু, দিনে তিনবার।

আসলে এ-সবই এক ধরনের তোষামোদ। কাজল একদিন না এলে, কিংবা সুধা অসুখে দু'দিন পড়ে থাকলে ও যে চোখে অন্ধকার দেখবে ! সে জন্যেই এত হেসে হেসে কথা।

তোষামোদ দরকার হয় না শুধু ধ্রুবর বেলায়, তখন আর মুখে হাসি আসে না।

ধ্রুব একদিন বলেছিল, ওদের এত তোয়াজ করে কি হবে, পাঁচটা টাকা কোথাও বেশি পেলেই তো কেটে পড়'ব। তখন আর...

প্রীতি রেগে গিয়ে বলেছিল, হেসে হেসে কথা বলবো না তো কি দিনরাত ওদের নিয়ে অশান্তি করবো!

সকলের সঙ্গে দিব্যি শান্তি বজায় রেখে চলবে প্রীতি, কিন্তু ধ্রুবর ভালমানুষিতেই ওর আপত্তি। যাও, বাড়িওয়ালা রাখালবাবুকে কড়া করে বলে এসো। অথচ ও বাড়িওয়ালা লোকটিকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চায়, মুখোমুখি হলেই উদ্বেগ বাড়ে, অশান্তি বাড়ে। এমন কি ভাড়া দেওয়ার পর রসিদটা দিতে দু'এক সপ্তাহ দেরি করলেও ওর কাছে গিয়ে মনে পড়াতেও ইচ্ছে করে না। রাখালবাবুদের চাকর-বাকরকে বলে, বাবুকে বলিস, রসিদটা এখনও পাই নি। কিংবা গোঁপওয়ালা বিহারী দারোয়ানকে বলে বাবুকে মনে পড়িয়ে দিতে।

তারপরও হা-পিত্যেশ করে বসে থাকা, কবে বাবুটি রসিদ পাঠাবেন। আর রসিদে কে যে সই করে কে জানে, ধ্রুব প্রথম দিকের রসিদের সঙ্গে সই মিলিয়ে দেখেছে ; এখন আর একেবারেই মেলে না। এ-সবে কোন আইনের প্যাঁচ আছে কিনা তাও জানে না। অথচ ধ্রুবর ভদ্রতাবোধে লাগে, বলতে পারে না, মশাই সইটা আমার সামনেই করুন। কিংবা—টাকা দিচ্ছি, রসিদটা এখনই দিয়ে দিন।

এ যেন জমিদার আর প্রজার সম্পর্ক। ভাড়ার টাকাটা দিতে যাবার সময় নিজেকে বড় ছোট লাগে।

অফিসের অবিনাশ হাসতে হাসতে বলেছিল, যত কমিউনিজম গ্রামের জমি নিয়ে, কোলকাতায় ষোল আনা ধনতন্ত্র।

ধ্রুব বলেছিল, ধনতন্ত্র বলছো কেন, এখনও সেই ফিউডেলিজম্। দশ বিশখানা বাড়ি থাকলেও কোন আপত্তি নেই।

ও-সব কথা বলে মনের ঝাল মেটানো যায়। কিন্তু বুকের ভিতর থেকে উদ্বেগ দূর করা যায় না। ভাড়াটে হয়ে থাকা মানেই একটা চিরন্তন অশান্তির সঙ্গে সহ-বাস করা।

সকালে দেখা দৃশ্যটা বারবার মনে পড়ছিল বলেই ধ্রুব মন থেকে

উদ্বেগটা দূর করতে পারছিল না। সকলেই তো বলে আজকাল নাকি ভাড়াটেকে তুলে দেওয়া যায় না। তা হ'লে ঐ দৃশ্যটা দেখতে হ'ল কেন ?

শেষ অবধি অবিনাশকেই বললে।

অবিনাশের পৈতৃক সূত্রে পাওয়া কিছু জমিজমা আছে হুগলিতে। গ্রামে চাষবাস হয়। এখানে বাড়ি ভাড়া করে আছে, কিন্তু র‍্যাশনকার্ড জমা দিয়ে পারমিট করিয়ে দারুণ ভাল চাল নিয়ে আসে গ্রাম থেকে।

ধ্রুব ওকে তাই ঠাট্টা করে বলে জমিদার।

অবিনাশের বেশ কিছু জমি ভেস্ট হয়ে গেছে, ক্ষতিপূরণের টাকা এখনও পায় নি। পেলেও তা সামান্য টাকা, সেজন্যে ঘুষ-ঘাস দিয়ে আদায় করার চেষ্টাও করে নি। বলে, যা ছোটাছুটি করতে হবে খরচ পোসাবে না।

কোলকাতার বাড়িওয়ালাদের ওপর ওর রাগ সেজন্যেই। রাগ আসলে বাড়িওয়ালাদের ওপর, না কি আইনকানুনের ওপর, তা ঠিক বোঝা যায় না। আসলে ভেস্ট হয়ে যাওয়া জমির মায়া ও ভুলতে পারে না। বলে, কোলকাতার একটা ফ্ল্যাটের দাম তো গ্রামের একশো বিঘে জমির চেয়ে বেশি। কিন্তু এখানে কোন গরমেন্টই হাত বাড়াবে না।

অবিনাশকে কিন্তু ধ্রুবর বেশ ভালই লাগে। ওর দেশে জমিজমা আছে বলে কোন ঈর্ষাও হয় না। বরং অবিনাশও ভাড়াটে বলে কেমন এক ধরনের আত্মীয়তা বোধ করে।

বেশ প্রাণখোলা মানুষ এই অবিনাশ। গায়ের রঙ চাপা, কালোই বলা চলে। চুলে ঈষৎ পাক ধরেছে। পাঞ্জাবির ওপব একটা জহরকোট পরে। মাঝে মাঝেই দাড়ি কামাতে ভুলে যায়, কিংবা দাড়ি কামায় না। কেউ সে-কথা বললে হাসতে হাসতে বলে, কি হবে গাল চকচকে করে, অফিসার করে দেবে ? না কি এবয়সে কোন মেয়ে এসে গালে হাত বুলিয়ে দেবে ?

যেন প্রতিদিন দাড়ি কামানোর প্রায়োজন ঐসব কারণেই।

সকাল থেকেই ধ্রুবর মনে অনেকগুলো প্রশ্ন। প্রীতির কাছ থেকেও শুনতে পায় নি কাজল কি জেনে এসেছে।

ও তো এতদিন বেশ নিশ্চিন্ত ছিল। রাখালবাবু যত অশান্তিই ঘটাক, ওকে তো আর বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারবে না। আইন

ভাড়াটেদের পক্ষে।

কিন্তু তা হ'লে ঐ ভদ্রলোকের আসবাবপত্র টেনে বের করে দিল কি করে? ভাড়া বাকি পড়েছিল? ভাড়া দিত না?

শেষে অবিনাশকেই বললে।

—আজ সকাল থেকেই ভাই মনটা খারাপ হয়ে আছে।

খাটো মাপের চেহারায় খাদির খয়েরী জ্যাকেটে অবিনাশকে আরো বেঁটে লাগে। কিন্তু সবসময়েই মুখে হাসি লেগে থাকে বলে দাড়ি কামিয়েছে কি কামায় নি চোখে পড়ে না।

অবিনাশ হাসলো। —আরে বৌ কাছে থাকলে মাঝে মাঝে মন খারাপ হবে না তাও কি হয়?

একটু থেমে বললে, আমি তো ভাই মাঝে মাঝেই বৌকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিই, বৌয়েরও মন ভাল থাকে, আমারও মন ভাল থাকে। নো খিটিমিটি, নো ঝগড়া।

ধ্রুব হেসে ফেললো। ও জানে অবিনাশ এই রকমই। বয়সে ধ্রুবর চেয়ে দু'বছরের বড় হলেও হতে পারে, কিন্তু সব দিক থেকে মানুষটা হাফ সেঞ্চুরি পিছিয়ে আছে। চেহারায়, পোশাক পরিচ্ছদে, কথা বলার ধরনে। আবার গুণগুলোতেও। হাফ সেঞ্চুরি আগেকার মানুষের মতই খোলামেলা মন, কোথায় একটা আন্তরিকতা আছে। বিপদের সময় এগিয়ে আসে, সান্ত্বনা দেয়। ওর সঙ্গে কি করে যে এত বন্ধুত্ব হ'ল ধ্রুব খুঁজে পায় না। ধ্রুব তো পোশাক আশাকের ব্যাপারে রীতিমত খুঁতখুঁতে। শার্টের কিংবা ট্রাউজারের ক্রিজ নষ্ট হল কিনা তা নিয়ে সদাই সচেতন।

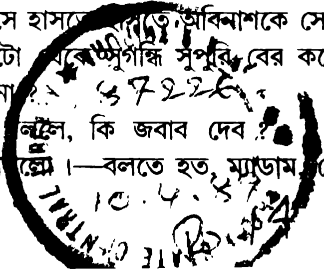
প্রীতির কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কি নিয়ে যেন ঝগড়াটা শুরু, ঝাঁঝের গলায় বলেছিল, তোমার শার্ট প্যান্টে ইস্ত্রি ঠেলে ঠেলে হাতের কব্জি তো খসে গেল!

কথাটা মিথ্যে নয়। ধ্রুব সত্যি একটু ঝকঝকে থাকতে ভালবাসে।

অফিসে এসে হাসতে হাসতে অবিনাশকে সে প্রসঙ্গ বলতেই অবিনাশ ধীরেসুস্থে কৌটো থেকে সুগন্ধি সুপুরি বের করে মুখে পুরে বলেছিল, জবাব দিলে না?

ধ্রুব হেসে বললে, কি জবাব দেব?

অবিনাশ হাসলো।—বলতে হত, ম্যাডাম, পোশাক আশাক কি আর



নিজের জন্যে ? ওসবে আমার কি দরকার। তবে কিনা তোমার স্বামী বলে তো পরিচয় দিতে হবে।

ক্যান্টিনে আরো কে কে যেন ছিল, শব্দ করে হেসে উঠেছিল।

এই হ'ল অবিনাশ।

সকালের দৃশ্যটার কথা বললে ও হয়তো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু না বলেও উপায় নেই। মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ, একটা দুর্ভাবনা। কোন একজনকে তো বলতে হবে। বলে হাল্কা হতে হবে। ভেবেছিল প্রীতিকে বলবে, কিন্তু সে তো বলার সুযোগই দিল না। কাপড়ে কতখানি সাবানের গুঁড়ো দিতে হবে, থালায় কেন ছাই লেগে আছে, আর বালতিতে জল ভরা নিয়েই ব্যস্ত। ঠিকে ঝি কিংবা রান্নার লোকের সঙ্গে, সেই ফাঁকে, গল্প জুড়ে দেয়। শুধু ধ্রুবর সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। সকালের প্রীতি আর সন্ধ্যের প্রীতি যেন দুটো পৃথক মানুষ।

শেষ অবধি অবিনাশকেই বললো। আসলে ও জানতে চায়, কিভাবে এটা সম্ভব হল। ও তো শুনে আসছে, আজকাল ভাড়াটেকে তোলা যায় না। তবে ? আইনের নিশ্চয় কোন ফাঁকফোকর আছে, সেটাই জানতে চায়। ও নিজেও না কোনদিন আইনের সেই ক্ষুরস্য ধারায় পড়ে যায়।

অবিনাশের কাছে দৃশ্যটা বর্ণনা করে বলতেই অবিনাশ বলে উঠলো, ইস্ !

বেশ যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠলো ওর চোখেমুখে।

ধ্রুব তো লোকটিকে চেনেও না, দেখে নি কোনদিন। তবু দৃশ্যটা দেখেছে। অবিনাশ সেটুকুও দেখে নি। তবু মনে হল ও যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খেল।

অবিনাশ একটু পরে বললে, ইনহিউম্যান।

এই শব্দটা ধ্রুবর মনের মধ্যেও সকাল থেকেই ঘুরছে। ওর কেবলই মনে প্রশ্ন জাগছে, ভদ্রলোক কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন কিনা। এই এত সব ফার্নিচার, হাঁড়িকুড়ি, একটা গোটা সংসার। হয়তো দশ কিংবা বিশ বছর ধরে একটু একটু করে সাজিয়েছিলেন। এখন কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলবেন ! স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায় গিয়ে উঠবেন ?

ধ্রুব বললে, ভদ্রলোক হয়তো ইদানীং অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ভাড়া বাকি পড়েছিল। অসুখ-বিসুখ চললে কার মনে থাকে !

অবিনাশ বললে, উঁহু, সেও তো আজকাল ইনস্টলমেন্টে দেওয়া যায়। অবশ্য জানি না....

ভাড়া বাকি পড়ার কথাটাই ভাবতে ভাল লাগছিল ধ্রুবর। কারণ, তা হলে ও নিশ্চিন্ত। ভাড়া বাকি ফেলার কথাই ওঠে না ওর ক্ষেত্রে। ফাইলের মধ্যে রসিদগুলো ঠিক ঠিক সাজিয়ে রেখেছে।

বেশ বোঝা গেল অবিনাশ নিজেও চিন্তিত। অবিনাশও তো ভাড়া বাড়িতেই থাকে, স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে। প্রথম জীবনটা ওর কেটে গেছে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, তারপর একটু সচ্ছল হতেই গ্রামের বাড়ি থেকে সংসার তুলে এনেছে।

ধ্রুব বললে, আমি ভাবছি ভদ্রলোকের কথা। আজকাল তো সকলেরই মাত্র দু'তিনখানা ঘর নিয়ে সংসার, বেচারির কোন আত্মীয়টাত্মীয় থাকলেও কি আর থাকার জায়গা পাবে!

অবিনাশও যেন ভদ্রলোকের জন্যে চিন্তিত। বললে, সত্যি, রাতটা কোথায় যে কাটাবে। তাছাড়া অত সব জিনিসপত্র। কি করবে কে জানে।

দু'জনই সেই অজানা অচেনা ভদ্রলোকের সমস্যার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় ডুবে গেল।

ধ্রুব হঠাৎ বললে, বোধহয় ভাল করে মামলা লড়তেও পারে নি। অবস্থা তো তেমন ভাল নয়, তোলা উনোন ছিল, গ্যাস স্টোভ কি সিলিণ্ডার তো দেখলাম না। ফ্রিজও না।

কথাটা বললে বোধহয় মনে জোর পাবার জন্যে। অর্থাৎ প্রয়োজন হলে ও নিজে কিন্তু ভাল উকিল দিয়ে মামলা লড়তে পারবে। ওর গ্যাস স্টোভও আছে। ফ্রীজও আছে। এই সব দুঃস্থ টাইপের লোকদের সঙ্গে এতদিন ও খুব একটা একাত্ম বোধ করেনি। বরং দূরত্ব রেখেই চলতো। অভাবে ওদের স্বভাব নষ্ট হয়, অনেকসময় ওদের ছেলেমেয়েরা বিগড়ে যায়, এই সব যুক্তি বানাতো। অথচ এখন ঐ ভদ্রলোক যেন আপনজন হয়ে উঠেছেন। কারণ উনিও ভাড়াটে।

অবিনাশ চাপা দুশ্চিন্তার হাসি হেসে বললে, রসিদটসিদগুলো দেখে রাখতে হবে, শালা এমনিতেই তো জল দেয় না।

তারপর একটু থেমে বললে, আমাদের পাড়ায় অবশ্য একজনকে গুণ্ডা

লাগিয়ে তুলে দিয়েছিল, সে অনেককাল আগে।

ধ্রুব অবাক হয়ে বললে, গুণ্ডা লাগিয়ে ? এই কোলকাতা শহরে ?

অবিনাশ হাসলো।—হ্যাঁ হে, এই কোলকাতায়। এখানে কি না হয় ? তবে সে ভদ্রলোক মামলা লড়ে ফিরে পেয়েছিলেন, কিন্তু লজ্জায় আর আসতে চাইলেন না।

—এই যে বাড়িওয়ালা ! শোনো শোনো তোমাদের কীর্তি।

সুনন্দকে যেতে দেখে অবিনাশ হাঁক দিল।

সুনন্দই বোধহয় প্রথম অবিনাশকে জমিদার আখ্যা দিয়েছিল, কারণ দেশে ওর কিছু জমিজমা আছে। তার পাল্টা জবাবে অবিনাশ ওকে বাড়িওয়ালা বলে ডাকে। কারণ সুনন্দর পৈতৃকসূত্রে পাওয়া একটা বাড়ি আছে।

বেশ ভাল বাড়ি, তিনতলা। আমহার্স্ট স্ট্রীটের ওপর।

বাড়িওয়ালা বললে সুনন্দ প্রথম প্রথম ক্ষুণ্ণ হত। ওটা নিশ্চয় কোন সম্মানজনক পরিচয় নয়।

একদিন রেগে গিয়ে বলেছিল, কি বাড়িওয়ালা বাড়িওয়ালা করেন।

পরক্ষণেই রেগে যাওয়াটা অশোভন মনে হওয়ায় ইয়ার্কির ঢঙে বলেছিল, যদি বলতেই হয়, ল্যাণ্ডলর্ড বলুন, আপত্তি করবো না।

অবিনাশ চোখ কপালে তুলে বলেছে, আরেব্বাস, ল্যাণ্ডলর্ড ! লর্ড বলতে হবে।

সুনন্দ তখনই চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েছে অবিনাশের কাছে। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলেছে।—অবিনাশদা, বাড়ি একটা আমার আছে ঠিকই, কিন্তু আমার অধিকারে মাত্র দু'খানা ঘর, তিন তলায়। শরিকি ঝামেলা বিস্তর, বেচে দেবো তার উপায়ও নেই, তার ওপর ভাড়াটেদের অত্যাচার।

অবিনাশ হেসে ফেলেছে। —তাই নাকি ? ভাড়াটেরাও অত্যাচার করে ?

সুনন্দ বোঝাবার চেষ্টা করেছে, অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছে। বলেছে, বাবা সেই কোনকালে ভাড়াটে বসিয়ে দিয়ে গেছে, কত ভাড়া পাই জানেন ?

সব শুনে মুখে বিষণ্ণ ভাব এনেছে অবিনাশ, কিন্তু ওর দুঃখ-বেদনা

কিংবা আরেকখানা ঘরের অভাব, এসবের কিছুই অবিনাশকে স্পর্শ করেনি।

বলেছে, দ্যাখো ভাই, তোমার অনেক দুঃখ মানছি, কিন্তু তোমার ভাড়াটেদের দুঃখ আরো বেশি। এই যেমন তুমি তাদের 'ভাড়াটে' বলো।

অবিনাশের আশেপাশে যারা ছিল, তারা শব্দ করে হেসে উঠেছে। কিন্তু আঘাত দেবার জন্যে বলেনি অবিনাশ। ও তাই সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, এই যেমন দেখ, আমার জমিজমা চলে গেছে, গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছে, তার জন্যে আমারও খুব দুঃখ। কিন্তু যাদের জমি নেই, পরের জমিতে চাষবাস করে, তাদের চেয়ে বেশি দুঃখ তো নয়।

সেই সুনন্দকে অবিনাশ আজ আবার ডাকলো বাড়িওয়ালা বলে। এখন আর বাড়িওয়ালা বললে সুনন্দ চটে না। ও বুঝে নিয়েছে, এটা অবিনাশের নির্দোষ ঠাট্টা। তাছাড়া এ অফিসে এই এতগুলো ভাড়াটের মধ্যে একা সুনন্দরই বাড়ি আছে সে পরিচয়টা খারাপ কিসে! বাড়ির মালিক হওয়ার মধ্যেও তো বেশ একটা গর্ব আছে।

তাই ডাক শুনে হাসতে হাসতে এসে বসলো সুনন্দ।

আর ধ্রুব সকালে যা যা দেখেছে বলে গেল। যতখানি দয়া মায়া এবং সমবেদনা সেই অচেনা অজানা ভদ্রলোকের জন্যে ঢেলে দেওয়া সম্ভব, কথার মধ্যে তা মিশিয়ে দিয়ে। তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের বিষণ্ণ লজ্জিত মুখের বর্ণনা দিল। এবং শেষে বললে, যাই বলো সুনন্দ, এটা একটা ইনহিউম্যান ব্যাপার।

সুনন্দর মুখ দেখে বোঝা গেল ও খুব আহত হয়েছে। যেন ধ্রুব বলছে, সুনন্দ, তুমিও একটা অমানুষ। হয়তো সত্যি তাই।

সুনন্দ প্রতিবাদ করলো। —দেশে আইন আছে, কোর্টকাছারি আছে। লোকটার নিশ্চয় গলদ কিছু ছিল....

অবিনাশ হাসতে হাসতে সুনন্দর উরুর ওপর একটা থাপ্পড় বসালো। বললে, সেটাই তো জানতে চাইছি। তুমি তো ভাই একজন ল্যাণ্ডলর্ড, অন্ধিসন্ধি তোমারই জানার কথা। কোন প্যাঁচে তাকে ওঠালো বলো তো, আমরা তা হলে সাবধান হতে পারি।

সুনন্দ কোন কথাই বলে নি, উঠে চলে গিয়েছিল। বেশ বোঝা গিয়েছিল ও রেগে গেছে।

ও চলে যাওয়ার পর ধ্রুব আর অবিনাশ দু'জনেরই অনুশোচনা হল। এভাবে সুনন্দকে আঘাত দেওয়া ঠিক নয়। অথচ আঘাত তো দিল। কিন্তু কেন ? ঈর্ষা ? সুনন্দর একটা বাড়ি আছে বলে কি ওদের মনে কোন ঈর্ষা আছে ? কই, কখনও তো মনে হয় নি। সুনন্দর সঙ্গে এতদিনের বন্ধুত্ব, পাশাপাশি টেবিলে বসে কাজ করে, একজনের বিপদে আরেকজন এসে দাঁড়িয়েছে কতদিন, অথচ তাকেই ওরা ভাবলো বিপরীত দিকের মানুষ। কি আশ্চর্য, একজন অজ্ঞাতকুলশীল, কেমন ধরনের লোক কে জানে, ধ্রুব তাকে কোনদিন দেখেও নি, চেনে না, জানে না, সেই লোকটাই ওদের সমবেদনা পেল। মনে হল আপনজন, আত্মীয় ! শুধু সেও একজন ভাড়াটে বলেই ?

বাড়ি ফেরার পথে ধ্রুবর মনে আবার উদ্বেগটা ফিরে এলো।

প্রীতি একসময় প্রায়ই বাড়ি করার কথা বলতো। মাথা গোঁজার মত একটা আশ্রয়। কিন্তু ধ্রুবর তখন বিষয়আশয়ের দিকে মন ছিল না। কিংবা ওর তেমন বিষয়বুদ্ধিই ছিল না। না, ওসব নিতান্তই অজুহাত। বাড়ি করার মত টাকাই ছিল না ওর।

এখনও নেই। তবু একটা আশ্রয়ের কথা ভাবতে হচ্ছে। দিনরাত অশান্তি নিয়ে বাস করা যায় না।

ফেরার পথে ধ্রুব সেই রাস্তাটা দিয়েই এলো। এখনও সব আসবাসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কিনা দেখে আসবে। ওগুলো যেন ওর বুকের ওপরই চেপে বসে আছে।

নাঃ, সব সরে গেছে, রাস্তাটা পরিষ্কার। কোথাও কিছু পড়ে নেই। কখন নিয়ে গেছে কে জানে, কোথায় গেছে তাই বা কে বলবে।

ওর বুকের ওপর থেকে একটা গুরুভার যেন নেমে গেল। তা হলে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু কি ব্যবস্থা। ধ্রুব ভেবেই পেল না। আজকাল তো আগেকার দিনের মত বাড়িতে বাড়িতে 'টু লেট' ঝোলে না।

দাদুর কাছে ধ্রুব শুনেছে ওঁদের সময়ে নাকি বাড়িওয়ালারাই ভাড়াটে পেলে ধন্য হয়ে যেত। নিয়মিত ভাড়া পেলে তো কথাই নেই। বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটের মধ্যে কোন ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-দ্বেষ ছিল না। দুয়ে মিলে যেন একই সংসার। একজনের বিপদ মানে অপরেরও। তখন

পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ছিল না, শত্রু ছিল বাইরে। চোর, গুণ্ডা, মাতাল।

কিন্তু এখন অন্যরকম। বাড়িভাড়া কথাটাই মিথ্যে হয়ে গেছে। বাড়ি কোথায়, দু'এক ঘরের ফ্ল্যাট যদি বা পাওয়া যায়, মাসমাইনের অর্ধেকটাই দিয়ে দিতে হবে। তার ওপর মোটা টাকা অ্যাডভান্স। কোত্থেকে পাবে সে-চিন্তা আমার নয়, দেবার লোক আছে। তাও কাছেপিঠে পাবে না, সরে যেতে হবে শহরের শেষপ্রান্তে। ফ্ল্যাটটাও মনঃপূত হবে না।

তা হলে ভদ্রলোক কি করে ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেললেন? হয়তো পাঁচজন আত্মীয়ের বাড়িতে ছড়িয়ে রেখেছেন। পরে নিয়ে যাবেন। কিন্তু নিজেরা? সেটা অবশ্য দু'পাঁচদিনের জন্যে সমস্যা নাও হতে পারে।

বুকের ওপর থেকে গুরুভার নেমে যেতেই বেশ হাল্কা মনে বাড়ি ফিরলো ধ্রুব।

দরজার বাইরে থেকেই বেশ খুশি খুশি অনেকগুলি কণ্ঠে হৈহল্লা শুনতে পাচ্ছিল। নিজেদের ফ্ল্যাটে, নাকি ওপাশের ফ্ল্যাটে থেকে, বুঝতে পারে নি।

না, নিজেদের ফ্ল্যাটেই। দরজাটাও খোলা, তাই অনেকগুলো চটি দেখতে পেল। মেয়েদের স্লিপার।

প্রীতি ফ্রীজ থেকে কি বের করছিল, ধ্রুবকে দেখতে পেয়েই হাসি হাসি মুখে বললে, কে এসেছে দেখবে এসো। ঢুকেই অবাক। ছোটপিসিমা আর দুই পিসতুতো বোন। রুনি আর সুমি।

প্রীতির এত খুশি হওয়ার কারণ ছোটপিসিরা বড় একটা ধ্রুবদের বাড়িতে আসে না। ওদের অবস্থা খুবই ভাল। পিসেমশাই বড় চাকরি করেন। সেজন্যে ধ্রুবর হয়তো নিজেকে ও বাড়িতে নগণ্য মনে হত। ওরা আসে না বলে ধ্রুবও যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। যায়, ঐ একবার বিজয়ার পর। ব্যস্।

রুমি বড়, এর মধ্যে আরো বড় হয়ে গেছে। দেখতেও বেশ সুন্দর হয়েছে। শুনেছিল গতবার এম এ পাশ করে গেছে। ধ্রুব ওদের হাতের দিকে তাকালো, রুমির বিয়ে নাকি! কই, নিমন্ত্রণের চিঠিফিটি তো নেই।

অথচ সবারই মুখে হাসি উপছে পড়ছে।

পিসিমা হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে ধ্রুবর হাতখানা ধরে বললে, কি

রে, সব সম্পর্কটম্পর্ক ছেড়ে দিলি নাকি ? একবারও যাস না।
ধ্রুবকেও হাসতে হল। —সময় কই বলো, তার ওপর বাসট্রামে যা ভিড়।
বাসট্রামে ভিড়ের জন্যেই মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, না সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটা ভাল অজুহাত এই বাসট্রামের ভিড়, সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলো না ও।
সুমি ছোট, কিন্তু কথার খৈ ফোটে ওর মুখে। বলে বসলো, ট্রাম-বাসে ভিড় বলে যাও না ? তা ধ্রুবদা, একটা ফোন করে দিলেই পারো, গাড়ি পাঠিয়ে দেব।
এতক্ষণে ধ্রুবর মনে পড়লো, বাড়ির সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা চিনতে পারে নি, হয়তো ড্রাইভার বদলে গেছে বলে। তাছাড়া, ওর মনেও হয়নি গাড়ি করে কেউ ওর কাছে আসতে পারে। ভেবেছিল অন্য কোন বাড়িতে কেউ এসেছে।
সুমির কথা শুনে ধ্রুব ভিতরে ভিতরে একটু অপ্রসন্ন হলেও মুখে হাসি আনলো।—গাড়ি যখন আছে, তখন তোরা এলেই তো পারিস।
পিসিমা তখনও হাত ছাড়ে নি ধ্রুবর। হাসতে হাসতে বললে, ভাইবোনের ঝগড়া এখন রাখ। যোধপুর পার্কে ফ্ল্যাট কিনেছি। এই মঙ্গলবার গৃহপ্রবেশ। তোরা যাবি কিন্তু।
এই ব্যাপার ! এর জন্যেই এত উচ্ছল হাসি আনন্দ।
ধ্রুবরও কিন্তু শুনতে বেশ ভাল লাগলো। আত্মীয়স্বজন কি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, কেউ বাড়ি করলে কিংবা ফ্ল্যাট কিনলে এক ধরনের আনন্দও হয়। কেমন একটা আশা জাগে, তা হলে আমিও হয়তো পারবো।
ধ্রুব খুশি-খুশি মুখেই বললে, দারুণ খবর। তা হলে ভাড়াটে নাম ঘুচলো, কি বলিস সুমি !
তারপরই বললে, আমরা তো ভেবেছিলাম, বাড়ি করবে ! ফ্ল্যাট কেন ?
সঙ্গে সঙ্গে বললে, তবে জমি তো আজকাল পাওয়াই যায় না। বোধহয় সান্ত্বনা দিতে চাইলে।
পিসিমা বললে, প্রীতি বলছিল, তোরাও একটা কিছু করার কথা ভাবছিস। করে ফেল এখনই।
প্রীতির মুখে তখনও হাসি। এগিয়ে এসে পিসিমাকে বললো, ওকে

বলুন না সেই জমির কথা।

পিসিমা বললে, শোন ধ্রুব, যাস একদিন। জমিই হোক ফ্ল্যাটই হোক্, যদি চাস, তোর পিসেমশাইয়ের কাছে অনেক খবর পাবি।

বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে ধ্রুবর পিসিমারা চলে গেল।

প্রীতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। —এবার আমাদেরও একটা কিছু করে নিতে হবে।

ধ্রুব কোন জবাব দিল না।

২

মানুষের উপকার করলে কখনো-সখনো বড় কাজে লেগে যায়।

বকুলবাগানের এই ফ্ল্যাটখানা পাওয়ার পর ধ্রুবর এ-কথাই মনে হয়েছিল। অথচ কারও উপকার করার কথা ও ভাবেনি।

প্রীতি আর অপেক্ষা করতে রাজি ছিল না। বিশেষ করে ধ্রুবর চাকরিতে একটা ছোটখাটো লিফট হওয়ার পর। ধ্রুব নিজেও আর অপেক্ষা করতে চায়নি।

হরিশ মুখার্জি রোডের যে ভাড়া বাড়িটায় ওরা থাকতো. একখানা দোতলা ছোট বাড়ি, সেখানে ঘরের সংখ্যা ছিল কম। ধ্রুবর বাবা মা এখনও সে-বাড়িতেই। ওর দাদা-বৌদিরা সেখানেই। শুধু ধ্রুবকে সরে আসতে হয়েছে। ধ্রুব জানতো, সরে আসতে হবে।

প্রীতি ওদের বাড়িতে নিতান্ত অপরিচিত ছিল না। কয়েকবারই গিয়েছে। নানা অজুহাতে।

ধ্রুবর মেজবৌদি রীতিমত বুদ্ধিমতী। দু'দিনেই ধরে ফেলেছিল। হাসতে হাসতে বললে. আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। যখন ঠিকই করে ফেলেছো ধ্রুবদা, বাবা-মাকে বলতে এত ভয় কিসের?

মেজবৌদি বয়সে ধ্রুবর চেয়ে সত্যি ছোট কি না বোঝা দায়। সেইজন্যেই হয়তো প্রথম থেকেই মেজবৌদি ওকে ধ্রুবদা বলতো।

ধ্রুবর বোন সুমিতা ঠাট্টা করে বলেছিল, সে কি গো বৌদি, ঠাকুরপো বলতে পারো না? ধ্রুবদা আবার কি!

তখন মেজবৌদি তো নতুন বৌ, সদ্য বিয়ে হয়েছে। ধ্রুব হেসে বলেছিল. বুঝতে পারছিস না, বয়েস কমানোর তাল।

মেজবৌদি হেসে ফেলে বলেছিল, না ভাই. বিয়ে যখন হয়ে গেছে এখন আর বয়েস কমাবো কোন দুঃখে।

আসলে এ-বাড়ির তুলনায় মেজবৌদি ছিল রীতিমত মডার্ন। ওর মুখে নাকি ঠাকুরপো, ঠাকুরঝি ধরনের কথা আসতো না, বলতে গেলেই হেসে ফেলতো। সেইজন্যেই ধ্রুবদা।

মেজবৌদির সঙ্গেই ধ্রুবর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুত্ব হয়েছিল বলেই তার কাছে ধরাও পড়ে গিয়েছিল ধ্রুব।

বিয়ের পর সকলের সামনে সেই সব দিনের কথা ফাঁস করে দিয়ে বলেছিল, ধন্য বাবা তোমরা দু'জন। কী নাটকই করলে। আমি ভাবতাম একসঙ্গে পড়ে, আজকাল তো সব বন্ধু-বন্ধু, হয়তো তাই।

একঘর লোক, সবাই হাসছিল। সে-সব উচ্ছল আনন্দের দিন। ধ্রুবর মেজদাও ছিল, লজ্জা পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সুমিতা টিপ্পুনি কেটেছিল, ছোটবৌদি কি ধূর্ত বাবা, কেউ টেরও পায়নি। মেজবৌদি তখন খুশিতে হাসছে।—তাই তো বলছি, দু'জনে টেবিলে ঝুঁকে পড়েছে বইয়ের ওপর, ফিসফিস করে কথা বলছে, দেখে আমি ভাবতাম, দু'জনের কি পড়ায় মন। ভিতরে ভিতরে যে এত চলছে…

প্রীতি অবশ্য প্রতিবাদ করেছে, এই না, সত্যি বলছি মেজবৌদি, তখন সত্যি পড়তাম।

—ছাই পড়তে। তারপর হেসে উঠে বলেছে, ওকে বই পড়া বলে না, প্রেমে পড়া বলে।

সকলে হো হো করে হেসে উঠেছে।

তবে ধ্রুব জানে, মেজবৌদি না থাকলে ব্যাপারটা এত সহজে হত না। বাবা মাকে বলতে সাহসই পেত না ও।

ও তো ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে, বাবা-মা যাবতীয় ধ্যান-ধারণায় কত গোঁড়া। বাবার হাতে তো সব সময় পাঁজি ঘুরছে। কালবেলা বারবেলা না দেখে কারও কোথাও যাওয়া চলবে না। মা তার চেয়েও বেশি।

মেজদার বিয়ে তো প্রায় ভেঙে যায়। ঠিকুজিকুষ্ঠির মিল হচ্ছিল না। অথচ মেজবৌদিকে দেখে মেজদার দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে।

শেষে নতুন একজন জ্যোতিষীকে শিখিয়ে পড়িয়ে ডেকে আনা হয়েছিল। ধ্রুবই সে-সব ব্যবস্থা করেছিল।

ধ্রুব তাই বলেছিল, দ্যাখো মেজবৌদি, তোমার একটু কৃতজ্ঞতা থাকা

উচিত। আমি ব্যবস্থা করে কুষ্ঠি না মিলিয়ে দিলে তোমার বিয়ে হত না।
মেজবৌদি জবাব দিয়েছে, আজ্ঞে না। হয়তো আরো ভাল বিয়ে হত। কৃতজ্ঞ থাকতে হয় তো তোমার মেজদার। আমাকে দেখে তারই মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

ধ্রুব হেসে বলেছে, সে তোমরা দু'জনে বুঝবে কার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু প্রীতিকে বিয়ে করতে চাই এ-কথা বাবা-মাকে তোমাদেরই বলতে হবে। আমি বলতে গেলেই হয়তো পাঁজি ছুঁড়ে মারবেন।

মেজবৌদি হেসে ফেলেছে। তারপর হাসি থামিয়ে বলেছে, দেখি কি করা যায়। বাবাকে রীতিমত ভয় পেত ধ্রুব। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, ঠাকুরদেবতায় ভক্তি, সব সময় নীতিনিয়ম মেনে চলেন। বাড়িতে নিজেদের মধ্যে একটু হাসিহুল্লোড় হ'লে ধমক দিতেন।

ধ্রুব জানতো, প্রীতিকে ও বিয়ে করতে চায় এ-খবর শুনলেই এ-বাড়িতে একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। সেজন্যেই বলতে পারছিল না।

প্রীতি যেদিন ধ্রুবর খোঁজে প্রথম এসেছিল, হাতে একরাশ বই খাতা নিয়ে, সেইদিনই রাত্রে খেতে বসে বাবা গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেছিলেন, মেয়েটি কে? আজ তোর খোঁজে এসেছিল?

তখন তো প্রীতি-সম্পর্কে কোন দুর্বলতা ছিল না। দিব্যি বলতে পেরেছিল, আমাদের সঙ্গে পড়ে। অসুখ হয়ে পড়েছিল, তাই নোট নিতে পারেনি। খাতাটা নিতে এসেছিল।

—হুঁ।

ব্যাস, আর কোন কথা বলেননি।

ধ্রুবর পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। ও বেশ বুঝতে পেরেছিল, ওর এ-বাড়িতে আসা, ধ্রুবর খোঁজ নেওয়া, বাবার পছন্দ নয়। মনে মনে সেজন্যে বাবার ওপর রেগেও গিয়েছিল। এইসব পুরোনো দিনের লোকদের নিয়ে মহা সমস্যা। ছেলেমেয়ে একসঙ্গে দেখলেই এরা প্রেম ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। অথচ তখন তো প্রীতির সঙ্গে ভালবাসাবাসি শুরু হয়নি। একসঙ্গে পড়তো, কাছাকাছি থাকতো বলেই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এসে হাজির হতো। অথচ ধ্রুব তাকে নিষেধও করতে পারতো না। নিষেধ করলেই তো প্রীতি হেসে উঠতো, বন্ধুবান্ধবদের কাছে গল্প করে বলতো,

আর সকলের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়তো যে ধ্রুবরা ভীষণ ব্যাকডেটেড। প্রাচীনপন্থী। সে এক লজ্জা।

কিন্তু তারপর হঠাৎ কি-ভাবে যেন মেজবৌদির সঙ্গে, সুমিতার সঙ্গে প্রীতির বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ধরা পড়ে গেল মেজবৌদির কাছে। অথচ প্রীতি তখন খুব কমই আসতো।

পরীক্ষাটরিক্ষা হয়ে গেল, দু'জনেই পাশও করে গেল। আর ধ্রুব খুব সহজেই একটা চাকরি পেয়ে গেল। সামান্য চাকরি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে একটা লিফ্‌ট পেয়ে গেল বছর খানেকের মধ্যেই।

মেজবৌদি বললে, ঠিক আছে আমিই বলবো। প্রতিদিন মেজবৌদি স্তোক দেয়, আজই বলবো।

আর ধ্রুব অফিস থেকে ভয়ে-ভয়ে ফেরে, বেশ রাত করে। না জানি ফিরেই কি শুনতে হবে।

এসেই মেজবৌদিকে প্রশ্ন করে, বলেছিলে ? কিংবা কোনদিন প্রশ্নও করতে হয় না। ওর চোখের দৃষ্টিই বলে দেয় প্রশ্নটা কি।

মেজবৌদি ঠোঁট উল্টে ইশারায় জানিয়ে দেয়, না, বলতে পারিনি। আসলে মেজবৌদিও ভয় পাচ্ছিল।

তারপর একদিন মেজবৌদি ওর ঘরে এসে হাজির। মুখে উচ্ছল হাসি। উচ্চকিত স্বরে বলে উঠলো, এই ধ্রুবদা, আমরা বাবাকে এতদিন একটুও বুঝতে পারিনি। একেবারে অন্য মানুষ, তোমরা কেউ ওঁকে চেনোই না।

ধ্রুবর মনে তখন উদ্বেগ আর কৌতূহল।—ব্যাপারটা কি তাই বলো।

—সে কথাই তো বলছি। বাবার গম্ভীর মুখটাই এতকাল দেখে এসেছো। ভিতরে কি আছে জানতে চাওনি।

ধ্রুব অধৈর্য হয়ে উঠলো, আঃ, বলোই না কি বললেন।

মেজবৌদি হাসতে হাসতে বললে, অনেক ধানাইপানাই করে তুললাম কথাটা। প্রীতিকে তো আপনি দেখেছেন···। মেজবৌদি আবার হেসে উঠলো।—বাবা সব শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর ; আমার তো বুক ধড়ফড় করছে। হঠাৎ বাবা কি বললেন জানো, শুনলে অবাক হয়ে যাবে।

—কি বললেন ?

মেজবৌদির মুখে এমন অঢেল হাসি দেখেই বুঝেছে সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। তবু উৎকণ্ঠা যায় না।

—বলো না, কি বললেন।

মেজবৌদি হাসতে হাসতে বললে, সেই অকালকুষ্মাণ্ড তোমাকে ঘটকালি করতে পাঠিয়েছে কেন ? নিজে এসে বলতে পারে না ? আমি বাঘ না ভালুক ? আমি তো তার বাবা।

ধ্রুবর মুখেও তখন হাসি ফুটেছে। হাসতে হাসতেই বললে, অসম্ভব। আমি নিজে গিয়ে এখনও বলতে পারবো না। কিন্তু রাজি হয়েছেন কি না বলবে তো ?

মেজবৌদি বললে, তোমরা মনে করো তোমরাই বেশি চালাক। বাবা কি বললেন জানো ? বললেন, ও আমি অনেকদিন থেকেই বুঝতে পেরেছি, শুধু ভাবছিলাম আহম্মকটা কিছু বলছে না কেন ! মেয়েটি শেষ পর্যন্ত রাজি হ'ল না নাকি।

ধ্রুব হেসে ফেললো। বললে, আর মা ?

—বাবার মত ছাড়া মা'র কি আর কোন মত আছে নাকি ? মাও খুশি। সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবর বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল। কিন্তু ওর তখন অবাক হবার পালা। সত্যি ভাবতে পারছিল না বাবা এত সহজ ভাবে নেবেন, এত সহজে মত দেবেন।

মেজবৌদি বললে, তার চেয়ে বড কথা কি জানো ? দিদি জিগ্যেস করেছিল, ঠিকুজিটা একবার মিলিয়ে নেবেন না ? বাবা উত্তর দিলেন, নিজেরা বিয়ে করছে, সেখানে আবার ঠিকুজিকুষ্ঠি কি হবে ? যেখানে আমরা ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছি, কেমন ভয়-ভয় করতো। অজানা অচেনা সব, তাই অত ভাবতে হয়। বলে হাসলেন।

ধ্রুব শুনে বললে, আমার কুড়িটা টাকা জলে গেল।

—কেন ? মেজবৌদি হেসে তাকালো ধ্রুবর চোখের দিকে। আর ধ্রুব বললে, বাবা যদি রাজিও হন, ঠিকুজি চাইবেন ভেবে জ্যোতিষীকে দিয়ে এমন রাশিচক্র বানিয়ে নিয়েছি প্রীতির, একেবারে রাজযোটক।

মেজবৌদি হাত পেতে বললে, এবার ঘটক বিদেয় কি দেবে দাও। বাবা নিজেই বলেছেন, ঘটকালি করতে তোমাকে পাঠালো কেন।

ধ্রুব বললে, দেব দেব।

তারপর বেরিয়ে গেল। তখনই খবরটা প্রীতিকে দেবার জন্যে। ইচ্ছে করেই সেদিন অনেক রাত করে ফিরেছিল। রাত্তিরে বাবার সঙ্গে, বাবার সামনে যাতে খেতে বসতে না হয়। কি বলে বসবেন, কি জিগ্যেস করবেন সেই ভয়ে।

তারপর বিয়েটা হয়ে গেল। হরিশ মুখার্জি রোডের সেই আগের বাড়িতেই। ঐ বৌভাতের দিনেই রাখালবাবুকে ভাল করে দেখেছিল। দু'একটা কথাও বোধহয় বলেছিল। তবে তেমন একটা আদর আপ্যায়ন করেনি। কেন করবে। ছোট হলেও পুরো বাড়িটাই ওরা তখন ভাড়া নিয়ে আছে। বাবা সদ্য রিটায়ার করেছেন, কিন্তু তিন ছেলেই চাকরি করে। বেশ সচ্ছল!

আর রাখালবাবু থাকতেন ওদের সামনের বাড়ির একতলার একখানা কি দেড়খানা ঘর নিয়ে। স্ত্রী ও দু'তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। দেখে মনে হত বেশ দুঃস্থ।

হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটার সামনেই রাস্তার ওপারে তখন ছিল টানা ব্যারাকের মত দোতলা একটি বিধ্বস্ত বাড়ি। তার খোপে খোপে অনেকগুলি ভাড়াটে পরিবার। তারই একটিতে থাকতো রাখালবাবুর সংসার। পলেস্তারা খসে খসে দেয়ালের ইঁট বেরিয়ে পড়েছে, জানালা দরজার কি রঙ ছিল বোঝাই যায় না, জানালা বন্ধ করার সময় সারা পাড়ার লোক শুনতে পেত। বাড়ির মালিক হেমন্তবাবু থাকতেন দোতলায়। বিরাট সংসার, এবং শেষের দিকে তাঁকে দেখেও বেশ দুঃস্থ মনে হত। ঘরে চল্লিশ পাওয়ারের টিমটিমে বাল্‌ব জ্বলতো, তাও দু'খানি কি একখানি ঘরে।

কিন্তু হেমন্তবাবু মানুষটি ছিলেন খুব সজ্জন। যৌবনে তাঁর হয়তো একটু সৌন্দর্য পিপাসাও ছিল। বাড়ির এককোণে একটা পলাশ গাছ যখন লাল হয়ে থাকতো, দেখতে ভালই লাগতো ধ্রুবর। দেয়াল বেয়ে ওঠা বোগেনভেলিয়া বয়েসের বলিষ্ঠতায় আর লতা ছিল না, প্রায় কাণ্ড। ফুলে ছাওয়া। পিছনের দিকে খালি জমিতেও ঘাসঝোপের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা গাছ নিতান্ত অযত্নেও ফুল ফোটাতো। সেটা তখন আর বাগান ছিল না, বেশির ভাগ সময়েই সেখানে নীচের ভাড়াটেরা কাপড় শুকোতে দিত। কাপড় শুকোনোর জায়গা নিয়ে, কিংবা কাপড় টাঙানোর দড়ি ছেঁড়া

নিয়ে ভাড়াটেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও শোনা যেত।

এই ভাড়াটেদেরই একজন রাখালবাবু। রাস্তায় যেতে আসতে কদাচিৎ দেখা হত। সুমিতা কিংবা বড়বৌদির কাছে ধ্রুব শুনেছিল ভদ্রলোক কিসের যেন ব্যবসা করেন। ধ্রুব ভেবেছিল, দোকানটোকান আছে হয়তো। ওঁর সম্পর্কে ধ্রুবর কোন ঔৎসুক্যও ছিল না। বৌভাতের দিনে যা দু'চারটে কথা।

তারপর হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হতেই রাখালবাবু ডেকে বসলেন।—এই যে ধ্রুব, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছেল।

ধ্রুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে পড়লো। মুখে হাসি আনলো।

—তোমার বড়দার কাছেই আমি গেসলাম, বড়দা বললেন, বুঝলে কি না, তুমি ভালো ইংরিজি জানো, তুমিই ভাল পারবে।

ধ্রুব রাখালবাবুকে এড়িয়ে চলে আসার জন্যে তখন ব্যগ্র। সদ্য অফিস থেকে ফিরছে, এমনিতেই ক্লান্ত। তাছাড়া তখন তো বিয়ের পরের দিনগুলো, প্রীতির কাছে ফিরে আসার জন্যেও বেশ একটা ব্যগ্রতা ছিল।

রাখালবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, সেজন্যেই তোমাদের কাছে ধর্না দেওয়া। তোমরা না করে দিলে কার কাছে যাই বলো?

ওঁর বলার ধরনে ধ্রুব একটু নরম হ'ল।—কি বলুন?

—আমাদের গাঁয়ে একটা ইস্কুল আছে, বুঝলে কি না। সেখানে একজন উপমন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বুঝলে কি না। তাঁর নামে ইংরিজিতে একটা অভিনন্দন লিখে দিতে হবে। সরকারী গ্র্যান্ট না বাড়ালে ইস্কুলটা উঠে যাবে।

ধ্রুবর একটুও ইচ্ছে ছিল না। সারা শরীর চিড়বিড় করে উঠেছে। রাগ গিয়ে পড়েছে দাদার ওপর। নিজে কাঁধ থেকে দায়িত্ব নামাবার জন্যে কি দরকার ছিল ধ্রুবর নাম করার। ধ্রুবই ভাল পারবে! কেন? তুমি নিজে করে দিতে পারতে না? কিংবা বলতে পারতে না, অন্য কাউকে বলুন!

রাখালবাবু বললেন, এই শনিবারেই চাই কিন্তু ধ্রুব। বলে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করেছেন।—সব লেখা আছে, দেখে নিও। ইস্কুলের নামটাম, উপমন্ত্রীকে কি বলতে হবে।

এ ধরনের কাজ কখনও করেনি ধ্রুব, জানেও না। তবু ঘাড় নেড়ে

সম্মতি জানাতে হয়েছে।

কাজের দায়িত্বটা নিয়েই রাখালবাবু লোকটির ওপরই ও রেগে গেছে, বিরক্ত হয়েছে।

বাড়িতে ফিরেই রাগ গিয়ে পড়েছে বড়বৌদির ওপর।—দাদার কি দরকার ছিল লোকটাকে আমার পিছনে লেলিয়ে দেওয়ার। অত যদি দয়ামায়া, নিজে করে দিলেই তো পারতো।

সব শুনে বড়বৌদিও রেগে গেছে। বলেছে, ওসব কথা আমাকে বলছো কেন, নিজের দাদাটিকে বললেই তো পারো।

কিন্তু যত রাগই হোক ধ্রুবকে কাজটা করে দিতে হয়েছিল। রাত জেগে, তিন দিন ধরে সেটা ঘষামাজা করে একটা গুরুগম্ভীর স্তবের মত করে লিখে দিয়েছিল।

শেষ হতেই প্রীতিকে বলেছিল, উপমন্ত্রীকে তৈলদান কমপ্লিট।

প্রীতি আধখানা পড়েই হেসে লুটোপুটি।

কিন্তু রাখালবাবু অভিনন্দন পত্রখানা পেয়েই একবার ভাঁজ খুললেন, ভাঁজ করলেন। তারপর পকেটে রেখে দিলেন। মুখে তৃপ্তির হাসি। পড়ে দেখলেনও না।

ব্যাস, এটুকুই পরিচয়, এটুকুই উপকার।

ঐ ব্যারাকের মত বাড়িটাকে ওরা উপেক্ষাই করতো। এমন কি ঐ বাড়ির মালিক হেমন্তবাবুকেও এড়িয়ে এড়িয়ে চলতো, যদিও মানুষটি ছিলেন খুবই সজ্জন, বিনয়ী ভদ্রলোক। ওঁর বিনয় হয়তো বা খানিকটা হতাশা থেকে, দারিদ্র্য থেকে। অথচ সত্যি তো দরিদ্র ছিলেন না। একটা বাড়ির মালিক। দরিদ্র হবেন কেন।

ধ্রুবদের ভাড়া-বাড়িটা ছিল রীতিমত ভাল, বলতে গেলে একেবারে ঝকঝকে নতুন। আর হেমন্তবাবুর নিজের বাড়িটা ধসে পড়া পুরনো বলেই মনে হতো, একরাশ জঞ্জালের মত। বোগেনভেলিয়া আর পলাশ গাছ থাকা সত্ত্বেও। সেজন্যেই হেমন্তবাবুদের বোধহয় ওরা উপেক্ষা করতো।

একদিন মাঝরাত্তিরে লরির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ধ্রুবর। জিনিসপত্র যেন নামানো বা ওঠানো হচ্ছে। কুলিদের কথাবার্তা।

ধ্রুব বিছানা ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসছিল। এত রাত্রে কিসের শব্দ জানার আগ্রহে। ও ভেবেছিল, রাখালবাবুর ড্রাম এসেছে। না, তা নয়।

এসে দেখলো, আসবাবপত্র ওঠানো হচ্ছে লরিতে।

ভেবেছিল, সামনের বাড়ির নীচেতলার ভাড়াটেরা কেউ উঠে যাচ্ছে। কিন্তু না, নীচেতলার ভাড়াটেরাও কেউ জানতে পারেনি। বোধহয় ঘুম ভাঙেনি তাদের। শুধু ধ্রুবরা লক্ষ্য করলো, পরপর ক'দিনই দোতলার কোন ঘরেই আলো জ্বললো না। শেষে একদিন জানা গেল হেমন্তবাবু বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছেন। বাড়ি বিক্রি করার লজ্জায় রাতের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে চলে গেছেন তিনি।

ধ্রুবর বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মানুষটির জন্যে।—বেচারা বোধহয় ভাল দামও পায়নি। গোপনে গোপনে তো বিক্রি করেছেন।

কে যে বাড়িটা কিনলো তা ধ্রুবরা জানতো না। অনেকদিন পড়ে ছিল, কোন নতুন মালিক এসে দোতলার দরজা জানলা খোলেনি।

এখন আর ধ্রুবর স্পষ্ট মনেও পড়ে না, নীচের ভাড়াটে রাখালবাবুরা কবে উঠে গেলেন। অন্য ভাড়াটেরাও।

শুধু মনে আছে, একদিন কয়েকজন লোক এসে কি সব মাপজোক করলো, আর পরের দিন থেকে বাড়িটা ভাঙতে শুরু করলো।

ওঃ, সে যে কি বিড়ম্বনা। মাসখানেক ধরে চললো বাড়ি ভাঙার কাজ। ধ্রুবদের বাড়ি তখন ধুলোয় ধুলো, যতবার ধোয়া মোছা হয়, দেখতে দেখতে ঘরগুলো আবার ধুলোয় ভরে ওঠে। কি বিরক্তিকর দিনই না গেছে।

নতুন বাড়ি উঠতে শুরু হ'ল সেই জমিতে। একটা সাইনবোর্ডও ছিল তখন। শোনা গেল ঐ জমিতে চারতলা বাড়ি উঠবে, আটখানা ফ্ল্যাট হবে। ফ্ল্যাট বিক্রি হবে।

প্রীতির তখন থেকেই খুব বাড়ি-বাড়ি নেশা। ও বলেছিল, খোঁজখবর নাও না, একটা ফ্ল্যাট কিনে রাখলে ভাল হত।

ফ্ল্যাট কেনার কথা ধ্রুব তখন কল্পনার মধ্যেই আনতে পারে না। টাকা কোথায়। তাছাড়া নিজেকে ও তখনও সংসার থেকে পৃথক করে ভাবতে শেখেনি।

তাই প্রীতির কাছে শোনা কথাটা গিয়ে বলেছিল বড়বৌদির কাছে। বলেছিল, বাবাকে একবার বলে দেখ।

বড়বৌদিরও বোধহয় কথাটা মনে ধরেছিল। ধ্রুব বড়বৌদিকে সঙ্গে

নিয়ে গিয়েছিল বাবার কাছে।—একটা ফ্ল্যাট কিনে রাখলে হত। একেবারে পাড়ায়, বাড়ির সামনেই।

ধ্রুবর বাবা হাসলেন।—এই বিরাট পরিবার, ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট কিনে কি হবে ? তার চেয়ে কোথাও জমিটমি পাওয়া গেলে বাড়ি করা যেত।

ব্যাস। ওখানেই সব স্বপ্ন থেমে গিয়েছিল। ওরা তখন সকলেই ব্যস্ত চাকরি নিয়ে। জমিটমি কে খুঁজবে। তাছাড়া বাবার কাছেও তেমন উৎসাহ পায়নি ধ্রুব। ইতিমধ্যে টিপু এসেছে। টিপু বড় হচ্ছে।

টিপু যতই বড় হচ্ছিল, ততই ঘরের অভাব দেখা দিচ্ছিল। ওদিকে একে একে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আসবাব বাড়ছিল ঘরের। পরিবারের লোকজন যতই বাড়ছে, বাড়িটা দিনেদিনে ততই যেন ছোট হয়ে যাচ্ছে। দাদার দু'দুটি ছেলে। স্কুলে পড়ে। মেজদার একটি মেয়ে, সেও স্কুলে। সবশেষে এই টিপু, এও বড় হবে। বড়বৌদির সবসময়ে অভিযোগ, ছেলেদের পড়ার জায়গা নেই। মেজবৌদির অভিযোগ মেয়ের শোবার জায়গা নেই। এর ওপর সুমিতার আরো নানান বায়না। আত্মীয়স্বজনের আসা-যাওয়ারও বিরাম নেই। মেয়ে-জামাইও আসে মাঝে মাঝে।

একটা অশান্তি যেন দানা বাঁধছিল দিনে দিনে। আর চোখের সামনে ফ্ল্যাট বাড়িটা উঠছে। সেই পলাশ গাছটাও নেই, বোগেনভেলিয়াও সারা পাড়াটা এখন আর আলো করে রাখে না। ওদিকে তাকালে মাঝেমাঝে হেমন্তবাবুর কথা মনে পড়ে। পুরনো হতশ্রী বাড়িটাকে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। পারলেন না। শেষে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে পালাতে হল।

সেইজন্যেই হেমন্তবাবুর জন্যে ধ্রুবর দুঃখ হয়। আচ্ছা, উনি কি আবার সেই ধ্রুবদের মতই ভাড়াটে হয়ে গেলেন ! নাকি যা কিছু টাকা পয়সা পেয়েছেন, অনেক দূরে, শহরের বাইরে গিয়ে নতুন একটা বাড়ি করেছেন। কেউ জানে না।

বারান্দা থেকেই প্রীতি একদিন ডাকলো, এই শোনো শোনো, দেখে যাও।

ধ্রুব টিপুকে নিয়ে খেলা করছিল। একটা খেলনা মোটরগাড়ি কিনে দিয়েছে টিপুকে। টিপুর আব্দারে সেটায় বারবার চাবি ঘুরিয়ে দম দিতে হচ্ছিল ওকে।

প্রীতি আবার ডাকলো, এসো না, দেখে যাও, কি সুন্দর রঙ করছে।

ধ্রুব উঠে গেল। বাড়িটা তখন শেষ হয়ে এসেছে। গিয়ে দেখলো, বাইরের দেয়ালে রঙ শুরু হয়েছে।

ধ্রুব দেখে বললে, বাঃ দারুণ লাগছে। খুব সুন্দর রঙ।

প্রীতি বললে, ঐ পরের বাড়ির প্রশংসা করেই জীবনটা কেটে যাবে, নিজেদের তো কিছু হবে না।

ধ্রুব দমে গেল। এই একটা কথা শুনলেই ওর নিজেকে বড় অক্ষম লাগে। অসহায় লাগে।

বাবার কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া যাবে না। আন্দাজে আন্দাজে যেটুকু বোঝে ধ্রুব, যা আছে বাবার—ওই পেনসান, তাতে তাঁর নিজের জীবনটা কেটে গেলেই যথেষ্ট। এত বড় পরিবারের জন্যে একটা বাড়ি করা সম্ভবও নয়। দাদা মেজদারা প্রায়ই এবাড়ির অসুবিধের কথা বলে। হয়তো কোনদিন নিজেরাই ফ্ল্যাট কিনবে।

এদিকে বাড়িওয়ালাও প্রায়ই উঠে যাওয়ার কথা বলছে।

প্রীতি একদিন বললে, দেখো ফ্ল্যাট কেনাটেনার কথা ভেবে লাভ নেই, বরং একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে উঠে চলো।

আসলে ধ্রুব নিজেই তো আর মানিয়ে চলতে পারছিল না। প্রীতি পারবে কি করে।

ও সব সময় একটা হীনমন্যতায় ভুগতো। এবাড়ির বড়বৌ, মেজবৌ দু'জনেই বাপের বাড়ি থেকে যথেষ্ট দানসামগ্রী নিয়ে এসেছে। প্রচুর গয়নাগাঁটি। এ বাজারের দরদামে হিসেব করলে অনেক টাকা। সে তুলনায় প্রীতি প্রায় কিছুই আনেনি। ওর বাবা অবশ্য সাধ্যের তুলনায় যথেষ্ট দিয়েছেন, কিন্তু প্রীতি জানে ওদের তুলনায় তা কিছুই নয়।

ওরা যখন জড়োয়া গয়নায় সেজে বিয়ে বাড়িতে যায়, প্রীতি সঙ্গে যেতে চায় না।

সেজন্যে ওর লজ্জা, সেজন্যে ওর রাগ। মনে মনে ভাবে, মেয়েরা কি কোনদিনই বদলাবে না! আসলে ছেলেরা না বদলালে মেয়েরাই বা বদলাবে কি করে।

কিন্তু এইসব থেকে ভিতরে ভিতরে একটু একটু করে বারুদ জমছিল। হঠাৎ একদিন বিস্ফোরণ ঘটলো।

প্রীতি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলে বসলো, আমি আর এ-বাড়িতে এক দণ্ডও থাকব না।

ধ্রুবও তার কথায় সায় দিল।—না, এক দণ্ডও না।

দপদপ করে পা ফেলে গিয়ে দাঁড়ালো বাবার কাছে। বাবা সব শুনেছেন। শুনলেও উনি আজকাল চুপচাপ থাকেন। কারও হয়ে কোন কথা বলেন না। উনি জানেন, এখন আর ওঁর কথার কোন দাম নেই। ছেলেদের ওপর ওঁর আর কোন জোর নেই। কারণ ছেলেরা সবাই এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে গেছে বলেই উনি সংসারের কাছে ফালতু মানুষ হয়ে গেছেন।

অথচ এই ছেলেরাই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে বলে বুকের ভিতরে একসময়ে কত গর্ব ছিল। গর্ব এখনও।

খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বুঝতে পারলেন ধ্রুব এসেছে ; কিছু বলতে চায়। তবু চোখ তুললেন না।

—বাবা !

—বল।

ধ্রুবর গলার স্বরে তখনও ক্রোধ উপছে পড়ছে। বললে, এই অশান্তি নিয়ে এ-বাড়িতে আর থাকা যায় না।

ধ্রুবর মা বারান্দার এক চিলতে রোদ্দুরে বড়ি শুকোতে দিচ্ছিলেন। ভুরু কুঁচকে একবার ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। বেশ রাগত স্বরে বললেন, অশান্তি তো তোরাই করছিস। সংসার তো এখন তোদের, শান্তি থাকলে তোদেরই, অশান্তি করলেও তোরাই।

—আমরা অশান্তি করছি ? ধ্রুব আরো রেগে গেল।

মা বললেন, তোরা সবাই। সংসার যখন আমাদের ছিল, তখন তো এ-সব অশান্তি ছিল না !

ধ্রুবর বাবা এতক্ষণে কথা বললেন।—এসবের মধ্যে আমাদের আর টানছিস কেন ! আমরা সাতেও নেই পাঁচেও নেই। দু'বেলা দুটি খাই, আর কাজ তো নেই, পড়ে পড়ে ঘুমোই। বেঁচে থাকাটাই বিড়ম্বনা।

বাবার গলার স্বরে, বলার ধরনে, কি যেন ছিল। ধ্রুবর মন নরম হয়ে আসছিল। হয়তো রাগ পড়েও যেত।

তার আগেই প্রীতি এসে দাঁড়িয়েছে।—আপনি বলছেন, এই সব

অন্যায় সহ্য করে চলতে হবে !

ধ্রুবর বাবা মুখ না তুলেই বললেন, আমি কিছুই বলছি না। রিটায়ার্ডম্যান, আমার আর বলার এক্তিয়ার কোথায় ?

প্রীতি বলল, বাবা, এভাবে অশান্তি বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। বলে ধ্রুবকে চোখের ইশারা করলো। অর্থাৎ যা বলতে এসেছিলে বলো।

ধ্রুব আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে, আমরা উঠে যাচ্ছি। আমরা উঠে গেলেই তো ওরা শান্তি পাবে।

প্রীতি বললে, হ্যাঁ বাবা, আমরা চলেই যাবো।

বাবা চোখ তুলে অবাক হয়ে তাকালেন ছেলের মুখের দিকে।

—চলে যাবি ?

মাথা নীচু করলেন। একটু থেমে বললেন, যেতে চাস, যা। কেউ যেতে চাইলে কি আর ধরে রাখা যায়।

হঠাৎ হেসে ফেললেন। হাসিটা কান্নার মত। বললেন, আমাদেরও তো যাবার সময় হয়ে এলো।

ধ্রুব আর প্রীতি চলে এলো। বাবার সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না ধ্রুব।

ফিরে আসতেই বড়বৌদি বলে বসলো, চলে যাবে সে তো ঠিক করেই রেখেছিলে, অজুহাত দেওয়ার দরকার কি ছিল।

ধ্রুব আরো রেগে গেল সে-কথা শুনে। কোন জবাব দিল না। কিন্তু চলে যাবো বললেই তো চলে যাওয়া যায় না। কোথায় যাবে ! তার আগে তো একটা ভাড়ার ফ্ল্যাট জোগাড় করতে হবে।

এই বাড়িটা যখন ভাড়া নিয়েছিল, তখন বাড়ির সামনে 'টু লেট' ঝুলতো। ভাড়াও কম। ভাড়া বাড়িয়ে বাড়িয়েও এখনও যথেষ্ট কম।

অফিসের বিনোদবাবু শুনে ধ্রুবকে বলেছিলেন, আপনি তো মশাই বিনা ভাড়ায় একটা গোটা বাড়ি নিয়ে আছেন। নতুন ভাড়াটেদের দুঃখ আপনি বুঝবেন না।

সত্যিই বুঝতো না ধ্রুব। কোনদিন তো খোঁজ করতে হয়নি। হয়তো দু'চারজনের কাছে শুনেছে, কিন্তু মনে দাগ কাটেনি।

অথচ এখন আর উপায় নেই। বলে ফেলেছে, চলে যাবো। আর মা এসে একটুও কান্নাকাটি করেননি। বাবাও বলেছেন, যেতে চাস, যা। এখন

আর উপায় নেই। মানমর্যাদার প্রশ্ন।

মেজবৌদি একদিন বললে, চলে যাবার আগে আমাকে অন্তত জানিয়ো ধ্রুবদা, দুম করে চলে যেও না।

অর্থাৎ সকলেই ধরে নিয়েছে ওরা চলে যাবে।

তখন ধ্রুবর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান একটা ভাড়ার ফ্ল্যাট। যার সঙ্গেই দেখা হয়, কথায় কথায় জানিয়ে রাখে। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে চোখ বুলিয়ে যায়। দালাল ধরে।

প্রীতি বলেছিল, তিনখানা ঘর না হলে চলে না। একখানা শোবার ঘর, একটা বসার। আর টিপু তো বড় হচ্ছে, ওর জন্যে একটা। ওতো বড় হচ্ছে, শোয়ার আর পড়ার জন্যে ঐ একটা বাড়তি ঘর দরকার।

প্রীতি ওর দাদাকেও বললে, একটু খোঁজ রাখতে।

সে সব শুনে বললে, তিনখানা ঘর ? সে তো চার পাঁচশো টাকা ভাড়া হবে। তাছাড়া এদিকে কোথায় আর পাবি। অনেক দূরে যেতে হবে।

প্রীতি বললে, চার পাঁচশোই দেবো।

—দিবি ? তা হলে খাবি কি ? পাঁচশো টাকা যদি ভাড়াতেই চলে যায় !

ধ্রুব সে-কথাও ভেবেছিল। একটু ভয় ভয় করতো। যদি চালাতে না পারি !

তখন অবশ্য এমন বাজার ছিল না। আর চার পাঁচশো টাকাতেও ফ্ল্যাট পাওয়া যেত।

কিন্তু হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে ধ্রুব তখন হয়রান হয়ে গেছে। কোথাও আর মনের মত ফ্ল্যাট মিলছে না। যদিবা পাওয়া যায় তাদের আবার ভাড়াটেকেই পছন্দ হয় না। বিনোদবাবুর কথাগুলো তখনই মনে পড়েছিল। পুরোনো ভাড়াটেদের ওপর কেন তাঁর এত রাগ বুঝতে পেরেছিল।

একদিন বলেছিলেন, আইনটাইন বদলানো উচিত। একশো দেড়শো টাকায় একটা পেল্লায় বাড়ি নিয়ে থাকবে কেন মশাই ? আর আমি তো চারশো দিতে চাই, কোথাও পাচ্ছি না।

শুনে বিছুটির জ্বালা ধরতো। যেন বিনোদবাবু ওদের হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটা সম্পর্কেই বলছেন।

ভাড়ার ফ্ল্যাট খুঁজতে খুঁজতে ধ্রুবও তখন বিনোদবাবুর দলে। ক্রমশই যেন হতাশ হয়ে পড়ছিল।

বাড়িতেও তখন সবসময় থমথমে ভাব। কোথাও কোন হাসিহল্লা নেই, রেডিও চলে না, চললেও চাপা গলায়, রেকর্ডে গান শোনা যায় না। যেন বাড়িতে কোন মুমূর্ষু রোগী আছে।

প্রীতি হেসে বলেছিল, এরই নাম কোল্ডওয়ার।

ধ্রুবর তখন একটাই কাজ। সকালে উঠেই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা। ঠিকানা থাকলে সটান সেখানেই চলে যাওয়া। বেশির ভাগই বক্স নম্বর। অতএব বসে বসে চিঠি লেখো। তারপর ব্রোকারের অফিসে তাগাদা দিতে যায়। রাস্তার মোড়ে কিংবা চায়ের দোকানের সামনে কোথাও কোথাও জনাকয়েক উটকো দালাল জটলা করে। তাদের কাছে গিয়ে জিগ্যেস করে, কিছু খবর পেলেন ? বেশ তোষামোদের গলায় বলতে হয়। যেন তারা ইচ্ছে করলেই একটা ভাল ফ্ল্যাট জোগাড় করে দিতে পারে। কামধেনুর মত তারা তিনচারটে দারুণ ভাল ভাল ফ্ল্যাটের খবর বলে। ধ্রুব উৎসাহ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ভাড়ার অঙ্কটা শুনতে হয়। শুনেই থমকে যেতে হয়। কিংবা অন্য কোন শর্ত।

কেউ কেউ ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে যায়। বাড়িটায় ঢোকার আগেই ফ্ল্যাট অপছন্দ, তবু দালালকে খুশি রাখার জন্যে চারতলায় উঠতে হয়, জানলা দরজা খুলে ঘর দেখতে হয়।

তারপর অন্য কোন কারণ দেখিয়ে বলতে হয়, না এটা চলবে না।

দালাল হাত পাতে, হেসে বলে, ঘোরাঘুরি তো করছি, দেখি...

পাঁচ, দশ, বিশ টাকা দিয়ে দেয় ধ্রুব। জানে, এদের অনেকের এই টাকাটাই রোজগার।

কোথাও পাড়াটা খারাপ, কোথাও বাড়িটা পুরনো, জানালা দরজা ভাঙা। কোথাও বাথরুম কিংবা রান্নাঘরই সমস্যা। অথবা আলোবাতাস নেই।

ধ্রুব বেশ বুঝতে পারে, যে-বাড়িটা ছেড়ে আসছে, ও সেই রকম একটা ফ্ল্যাট খুঁজছে। যে পাড়া ছেড়ে আসছে, সেই রকম পাড়া খুঁজছে।

দেখতে দেখতে দুটো মাস পার হয়ে গেল। প্রীতি অনুযোগের স্বরে বললে, তোমার এখান থেকে যাওয়ার ইচ্ছে নেই সে-কথাটা ফ্র্যাঙ্কলি

বললেই তো পারো।

ধ্রুব অবাক হয়ে তাকালো প্রীতির মুখের দিকে। কোন কথা বললো না। একটা অক্ষমতা, একটা অসহায়তার মধ্যেই ও তখন নিপীড়িত। প্রীতির কথায় ও বোধহয় রীতিমত ধাক্কা খেল।

বাড়ির পরিবেশও এদিকে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

ঠিক সেই সময়েই একটা ঘটনা ঘটে গেল। অভাবিত।

ফ্ল্যাট দেখতে যাওয়ার জন্যে প্রায়ই লেট হয়ে যেত অফিসে। কোন কোনদিন অবশ্য প্রীতি একাই চলে যেত। টিপুকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর এক সময় বিষণ্ণ মুখ নিয়ে ফিরে আসতো।

সেদিনও বিকেলে একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা। টেলিফোনে অফিসেই খবর পেল। তাই একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলো।

ফিরেই দাদার মেয়ে সিমলির কাছে শুনলো, ছোটকাকিমা বেরিয়ে গেছে।

—কোথায় গেছে বলে গেছে?

সিমলি ঠোঁট ওল্টালো।—কি জানি।

এটাই এখন এ বাড়ির রীতি। যেটুকু খবর বলেছে সেটুকুই যেন বাড়তি। বড় অভিমান হয়, বুকে লাগে। বিয়ের আগে দাদা বৌদিরা কত আপন ছিল। এই সিমলিকে ধ্রুব তো কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। অথচ এখন সিমলিও যেন কেমন পর-পর। হয়তো মা-বাবার কথা শুনে শুনে দূরে সরে যাচ্ছে।

ঠোঁট উল্টে 'কি জানি'। যেন জানার প্রয়োজনই নেই। দোষ শুধু সিমলির নয়। প্রীতিও ওদের কোন কথা জানিয়ে যায় না। ধ্রুবকেও তখনই বেরোতে হবে, তা না হলে বাড়িওয়ালা থাকবে না। এদিকে সন্ধ্যেও হয়ে আসছে। ও ভেবেছিল, প্রীতিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। ভাবলো, একাই চলে যাই।

বেরোতে যাচ্ছে, মেজবৌদি বললে, প্রীতি তো, সেই গুণ্ডামতো দালালটা এসেছিল একদিন, একটা হাত কাটা, তার সঙ্গে কি সব কথা বলছিল, হঠাৎ বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে।

গুণ্ডামতো! কথাটা কানে বিস্বাদ লাগলো ধ্রুবর। মনে হল যেন ইচ্ছে করেই বললে মেজবৌদি।

কিন্তু লোকটিকে চিনতে পারলো। বেঁটেখাটো দারুণ ভালো স্বাস্থ্য লোকটির। কপালে একটা দাগ আছে, বাঁহাতের কনুই থেকে ফুল হাতা শার্টের হাতাটা ঝুলে থাকে। ওটুকুর জন্যেই লোকটিকে নিরাপদ মনে হয়। কিন্তু সব মিলিয়ে তাকে ধ্রুবরও অপছন্দ। কথাবার্তাতেও অশালীন।

ঐ লোকটার সঙ্গে প্রীতি একা বেরিয়ে গেল ? কোথায় কতদূরে নিয়ে যাবে কে জানে। এত তাড়াহুড়োর কি ছিল। ওকে তো সন্ধ্যের পর কিংবা কাল সকালে আসতে বললেই হত।

বাড়িওয়ালা লোকগুলোকে এই দু'মাসে হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছে ধ্রুব। কথাবার্তার ধরনই অন্যরকম। এই আজ যেখানে যাবার কথা, দালাল ফোন করতেই ও বললে অফিস ছুটির পর যাবে। সে উত্তর দিলে, তা হলে উনি বেরিয়ে যাবেন, বলেছেন সাড়ে ছ'টার মধ্যে যেতে হবে। যেন ট্রেন ধরার ব্যাপার, ঘড়ি ধরে পৌঁছতে হবে। অবশ্য বলা যায় না, দালালটির নিজের ব্যগ্রতাও হতে পারে। একটা ফ্ল্যাট জুটিয়ে দিলেই তো একমাসের ভাড়া পাবে।

প্রীতির জন্যে খানিকটা উৎকণ্ঠা নিয়েই বেরিয়ে পড়লো ও।

বাস স্টপে পৌঁছতেই দেখতে পেল ট্যাক্সি থেকে নামছে প্রীতি।

ধ্রুব কিছু প্রশ্ন করার আগেই প্রীতি হাসতে হাসতে বলে উঠলো, দারুণ সুন্দর ফ্ল্যাট। এইমাত্র দেখে এলাম। কাছেই, বকুলবাগানে।

এমন স্বতঃস্ফূর্ত হাসি প্রীতির মুখে বহুদিন দেখেনি ও।

প্রীতি বললে, আজই, এখনই টাকা নিয়ে চলে যাও। তা না হলে, কাল সকালে একজন আসার কথা।

ধ্রুব বললে, কিন্তু দালাল লোকটা এলো না কেন ? কোথায় পাবো ওকে ?

প্রীতি ভুরু কুঁচকে বললে, কি যে বলো, ঐ গুণ্ডাটাইপের লোকটাকে কি আমি ট্যাক্সিতে সঙ্গে নিয়ে আসবো !

তারপরই বললে, ওর চেহারাটাই ঐ রকম, লোকটা কিন্তু ভীষণ ভাল।

মেজবৌদি বলেছিল 'গুণ্ডামতো', তখন খুব খারাপ লেগেছিল। এখন প্রীতি বলছে গুণ্ডাটাইপের। শুনতে অন্য কারণে খারাপ লাগলো। একটা ভাল ফ্ল্যাট পাওয়া গেছে, অন্তত পাওয়ার আশা। ঐ লোকটাই জোগাড় করে দিচ্ছে, তাই এখন ওকে গুণ্ডাটাইপ বলতেও খারাপ লাগছে।

ধ্রুব জিগ্যেস করলো, কোন তলায় ? ভাড়া কত ?

প্রীতি বললে, ওকে সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সিতে আসবো না বলেই বুদ্ধি করে বললাম, আধ ঘণ্টা পরে আসতে।

ধ্রুব আগের প্রশ্নগুলো আবার করলো।

প্রীতি বললে, দোতলায়, সাড়ে চারশো। শুধু এক মাসের অ্যাডভান্স।

সাড়ে চারশো। প্রীতির দাদার কথাটা মনে পড়লো। বাড়ি ভাড়াতেই অত বেরিয়ে গেলে খাবে কি ? কথাটা সেদিন বুকে গিয়ে লেগেছিল, কিন্তু কথাটা তো সত্যি। তা হোক। ধ্রুব ভাবলো, যেমন করে হোক চালিয়ে নেবো। এই একটা দিক নিয়ে কারো কোন ভাবনা নেই। না সরকারের, না কোম্পানিগুলোর। মাইনে দিয়েই দায়দায়িত্ব শেষ। তার অর্ধেক যে বাড়িওয়ালার গর্ভে চলে যাবে সে খেয়ালই নেই। অর্থাৎ কোলকাতায় থাকার তোমার অধিকারই নেই, আহা, ডেলি প্যাসেঞ্জারি করো। সেখানেও ঘন ঘন ট্রেন লেট, মানে হাজরি-খাতায় লাল দাগ। বড় সাহেব, মেজ সাহেবের লাল চোখ।

ওদের তো কোন চিন্তা নেই, অফিসের খরচায় ভাল-ভাল ফ্ল্যাট। গাড়ি। ব্যাটারা পাংচুয়েলিটির বড়াই করে।

ওদের জন্যে কোম্পানিগুলো বেশি বেশি টাকা দিয়ে ভালো ফ্ল্যাটগুলো নিয়ে নিচ্ছে বলেই তো সাধারণ মানুষের এই হাল।

পকেটে টাকাটা নিয়ে ধ্রুব অপেক্ষা করলো বাড়িতে ফিরে। দালাল লোকটা কখন আসে। আসবে তো!

—দক্ষিণ খোলা ?

প্রীতি অবাক হয়ে তাকালো। বললে, তা তো জানি না। রান্নাঘরটা বেশ বড়ো। বাথরুম ছিমছাম, পরিষ্কার।

দক্ষিণ খোলা কি না তা দেখার প্রয়োজনই বোধ করেনি ও। তাই স্তোক দেবার মত করে বললে, দক্ষিণে আর কতটুকু হাওয়া আসে।

—বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা হল ?

—না। বাড়িতে একটা ইয়া গোঁপওয়ালা দারোয়ান আছে. সেই দেখালো ফ্ল্যাটটা। দালালটা বললে, বাড়িওয়ালার সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে হবে। কোন কোম্পানি, কত মাইনে, আরো কি সব জানতে চাইবে। এর আগে একজনকে দেয়নি। একজন মাদ্রাজী আজই দেখে

গেছে, কাল আসবে সকালে।

ধ্রুব বললে, তা হলে আর গিয়ে লাভ কি, ইন্টারভিউয়ে ফেল করে যাবো। একজন মাদ্রাজী ক্যাণ্ডিডেট যখন আছে···বাড়িওয়ালারা আজকাল খুব মাদ্রাজী পছন্দ করে।

প্রীতি হেসে বললে, না এখন আর তা নেই ; এখন ওরা মাদ্রাজীদেরই বেশি ভয় পায়। বাঙালীকে ফ্রায়িংপ্যান ভাবতো, এখন ফায়ার কি বস্তু বুঝতে পারছে। দালালটা অবশ্য সে-রকমই বললে।

দালালটা, দালালটা। ধ্রুবর শুনতে ভাল লাগছিল না। ব্রোকার বললেই তো হয়। কারণ, ওই একজন এতকাল পরে একটু আশার আলো দেখিয়েছে। ও তো হতাশ হয়ে পড়েছিল। হতাশ এবং ক্লান্ত।

লোকটা এলো। পকেটে টাকা নিয়ে ধ্রুব বেরিয়ে গেল।

রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে লোকটা কেবলই বলছে, ঐ তো আর একটু। বাড়িটা এত চমৎকার, ফাস্টক্লাশ ফ্ল্যাট, বৌদির খুব পছন্দ হয়েছে।

সামনেই একটা ঝকঝকে চমৎকার বাড়ি, দোতলায় ব্যালকনি আছে। একেবারে ছবির মত সুন্দর। ধ্রুব ভাবলে, ঐ বাড়িটাই। বাইরে থেকে দেখে ফ্ল্যাটটা ভারী ভাল লেগে গেল। ধ্রুব ভাবলে ওটাই হবে হয়তো। বেশ খুশি হয়ে উঠলো।

কিন্তু না। ওটা নয়। লোকটা ও বাড়ি পার হয়ে এগিয়ে চলেছে। আরেকটা বেশ ভাল বাড়ি। ঝকঝকে নতুন। এটাই হয়তো, ধ্রুব ভাবলে।

না, ওটাও নয়।

শেষে আরেকটা বাঁক নিয়ে সরু গলিটার মধ্যে ঢুকলো। গলিটা দেখেই ওর পছন্দ হয়নি। কিন্তু বাড়িটা ভাল লেগে গেল। আগে যে দুটো চমৎকার বাড়ি ওর মন কেড়েছিল, সুন্দর লেগেছিল, তেমন ভাল নয় এটা। তবু মনকে বোঝালো, খারাপই বা কি!

বাইরে থেকে দেখলো। তারপর বললে, ফ্ল্যাটটা আমি তো দেখিনি, একবার দেখলে হয় না?

দারোয়ান বললে, চলিয়ে। লেকিন বাত্তি নেই।

সিঁড়িতে আলো ছিল। কিন্তু ফ্ল্যাটের ঘরগুলো একেবারে অন্ধকার। আগের ভাড়াটে ভদ্রলোক তাঁর বাল্‌বগুলো খুলে নিয়ে যেতে ভোলেননি।

দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে যেটুকু দেখা যায় দেখলো ধ্রুব। পছন্দ হল কি

হল না নিজেও বুঝতে পারলো না।

দালাল লোকটি বললে, বৌদির কিন্তু খুব পছন্দ হয়েছে।

লোকটার মুখে বারবার বৌদি কথাটা ভালো লাগছিল না।

আসলে ধ্রুবর চেয়েও দালালটির ব্যগ্রতা যেন বেশি।

ধ্রুব বললে, ঠিক আছে।

দরজায় তালাচাবি লাগালো দারোয়ান।

গোঁপওয়ালা বিহারী দারোয়ানের পিছনে পিছনে ওরা নেমে এলো।

দরজার বাইরে এসে দারোয়ান ওদের বললে, টহরিয়ে। অর্থাৎ অপেক্ষা করুন।

বলে আবার সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে গেল। যাবার আগে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে গেল।

লোকটা খুবই সাবধানী। বিশ্বাস করে দরজাটা খুলে রেখেও গেল না। সঙ্গে করে ওপরেও নিয়ে গেল না।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করার জন্যে এভাবে অপেক্ষা করতে হলে বড় হীনমন্যতায় ভুগতে হয়। ধ্রুব সেজন্যে ভিতরে ভিতরে বিরক্তি বোধ করছিল। লেনদেনের ব্যাপার। তুমি ভাড়া দেবে, আমি ভাড়া নেবো। দুজনেরই স্বার্থ। তুমি আমার উপকার করার জন্যে ভাড়া দিচ্ছো না। তুমি তিনতলার হাওয়া খেতে চাও, তাই নীচের তলা এবং দোতলা বানাতে হয়েছে। সুতরাং সেগুলো খালি ফেলে রাখতে চাও না। হিসেব করে দেখেছো, ফেলে রাখলে লোকসান। তাই ভাড়া দিচ্ছো। দয়া করে নয়। অথচ ভাবটা এমন, যেন উনি জমিদার আর ধ্রুব প্রজা।

এভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে ধ্রুবর খুবই খারাপ লাগছিল। অথচ মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ। ওকে বাড়িওয়ালার পছন্দ হবে কি না, ভাড়া দিতে রাজি হবে কি না।

পছন্দ না হলে হয়তো এক কথায় বলে দেবেন, না মশাই দেবো না। কিংবা ভদ্রতা করে বলবেন, আগে এলেন না, একজনকে দিয়ে ফেলেছি।

দু'মাস ধরে ঘুরে ঘুরে এদের চিনে ফেলেছে ধ্রুব।

কিছুক্ষণ পরেই গোঁপওয়ালা দারোয়ানটা ফিরে এলো। বললে, চলিয়ে। ধ্রুব তার পিছনে পিছনে ওপরে উঠে গেল।

একটা দরজা দেখিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকতে বললো দারোয়ান।

ধ্রুব পা বাড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক গলায় বললে, আপনি!

ভদ্রলোকও চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মুখে হাসি। বললেন, বসো, বসো।

ধ্রুব বসলো। তাকিয়ে তাকিয়ে চারপাশ দেখে নিল। বেশ গোছানো বসার ঘর। দামী সোফা কৌচ, রবারের গদি। নীচে কার্পেট।

এ-সবে যত না অবাক তার চেয়ে বেশি ভদ্রলোকের পোশাক-আশাক দেখে।

সেই রাখালবাবু। ওদের বাড়ির সামনে হেমন্তবাবুর ধসে পড়া জরাজীর্ণ বাড়ির একতলার দেড়খানা ঘরে যিনি থাকতেন। তাঁকে তো লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে বাজারে যেতে দেখে এসেছে, ধুতি পাঞ্জাবি পরে যখন কাজে বেরোতেন, কি কাজ কে জানে, ধুতিটা হাঁটু অবধি উঠে থাকতো।

সেই রাখালবাবুর পরিধানে এখন ট্রাউজার্সের শোভা। অনভ্যস্ত বলে কেমন ঢিলেঢালা। গায়ে চকরবকর বুশশার্ট।

ধ্রুব হাসতে হাসতে বললে, আপনার বাড়ি! আমি ভাবতেই পারিনি।

রাখালবাবুও হাসলেন।—সবই লক্ষ্মীর কৃপা।

তারপর বললেন, তোমরা তা'হলে এখনও ভাড়বাড়ি খুঁজছো? কিছু একটা করলে না?

অর্থাৎ বাড়ি।

ধ্রুব বললে, কই আর হল। তবে ওঁদের জন্যে নয়, আমি খুঁজছি আমার নিজের জন্যে।

রাখালবাবু বললেন, সেই ভালো, ঐ জয়েন্ট ফ্যামিলি শুধু শুনতেই ভাল, যত দূরে থাকবে তত শান্তি।

ধ্রুব শুধু হাসলো। ভদ্রলোক তা হলে সবই বুঝে ফেলেছেন।

ও পকেট থেকে টাকাটা বের করলো। বললে, এই নিন সাড়ে চারশো।

রাখালবাবু যাতে দোমনা হবার সুযোগ না পান সেজন্যেই, নাকি তাঁর গলার স্বরেই বুঝে নিয়েছে ফ্ল্যাট ও পেয়ে গেছে, তাই বৃথা বাক্যব্যয় না করে ধ্রুব টাকাটা এগিয়ে দিল।

রাখালবাবু হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিলেন। ধীরে সুস্থে বুকপকেটে

রাখলেন, তারপর হাসতে হাসতে বললেন, লক্ষ্মী আর সরস্বতীর মিল হয় না, বুঝলে কি না। তোমরা এখনও সেই ভাড়াটে।

বলে উঠে গিয়ে রসিদ বইটা নিয়ে এলেন। বললেন, তুমি আমার একটা উপকার করেছিলে একবার, আমি ভুলিনি।

রসিদটা লিখতে গিয়ে পকেট থেকে টাকাটা বের করলেন। গুণেগুণে পাঁচটা দশ টাকার নোট ফেরত দিয়ে বললেন, তুমি চারশোই দিয়ো, পাশের ফ্ল্যাটও তাই দেয়।

একমুখ হেসে ধ্রুবর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভেবেছিলাম ভাড়া বাড়াবো, পঞ্চাশ টাকা বেশি নেবো। থাক্, ঐ চারশোই দিয়ো।

কড়কড়ে পাঁচখানা দশটাকার নোট ফেরত পেয়ে ধ্রুব তখন খুশিতে ডগমগ। বারবার খোঁচা দিয়ে ভাড়াটে ভাড়াটে বলছিলেন বলে যেটুকু তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল মনের মধ্যে নিমেষে তা মিলিয়ে গেল। না, ইচ্ছে করে বলেন নি। তা হলে কি উপকারের কথা তুলতেন।

ফেরার পথে ও যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে চলেছে।

আর তখনই মনে হয়েছে, মানুষের উপকার করলে কখনো-সখনো বড় কাজে লেগে যায়।

অথচ ও তো উপকার করতে চায়নি। বরং বিরক্ত হয়েছিল। নিতান্তই বাধ্য হয়ে, ভদ্রতার খাতিরে অভিনন্দনপত্র লিখে দিয়েছিল।

আশ্চর্য, রাখালবাবু কিন্তু সেকথা মনে রেখেছেন। মনে করে রেখেছেন বলেই বোধহয় পঞ্চাশ টাকা ভাড়া কমিয়ে দিলেন। ইচ্ছে করলেই তো নিতে পারতেন।



ধ্রুব যেন যুদ্ধ জয় করে ফিরছে এমন একটা আনন্দ নিয়ে হাঁটছিল। ওদের দোতলা বাড়িটার সামনে রাস্তার ওপারে বিশাল চারতলা ফ্ল্যাট বাড়িটা মাথা তুলে দাঁড়ানোর পর থেকে ওদের দক্ষিণ চাপা পড়ে গেছে, হাওয়া ঢোকে না। ধ্রুবর ঘরে তো একেবারেই না। জানালা আছে, সামনের দিকে বেশ খানিকটা ফাঁকা, তবু বাতাসের নামগন্ধ নেই। জানালা তো আর হাত ধরে দখিনা বাতাসকে আসুন আসুন বলে ডেকে আনতে পারে না। সে আসার আগে বেরোনোর রাস্তা আছে কিনা দেখে নেয়। কোথায় যেন পড়েছিল, চোর এবং হাওয়া একই চরিত্রের, পালানোর পথ না থাকলে ঢোকে না।

রাখালবাবুর ফ্ল্যাটে উঠে এলে নিশ্চয় প্রচুর হাওয়া পাবে। আর কতখানি জায়গা। তিন তিনখানা ঘর।

মনের ভিতর তখন একটা দারুণ ফুর্তি। রাস্তায় বেশ হাওয়া দিচ্ছে। বাড়িতে না থাক, রাস্তায় হাওয়া থাকে বলেই তো বিকেল হতে না হতে সকলেই বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তাই এত ভিড়।

ধ্রুব এসে ঘন ঘন দরজার কড়া নাড়লো। কলিং বেলটা অনেককাল খারাপ হয়েছে, সারানো হয়নি। কেই বা মিস্ত্রি ডেকে এনে সারাবে। ধ্রুব ইচ্ছে করেই মিস্ত্রি খুঁজতে যায়নি। বারবার ওকেই যেতে হবে কেন। দাদা কিংবা মেজদাও তো ডাকতে পারতো। সবাই ভাবছে আরেকজন কেউ ডেকে আনবে। মিস্ত্রি ধরে আনাও এক ঝামেলা, একবার গেলেই তো আর পাবে না। তাছাড়া বেল্‌টা খারাপই হয়ে গেছে, নতুন কিনতে হবে। যে কিনে আনবে তাকেই দিতে হবে টাকাটা। বাবা রিটায়ার্ড মানুষ, এখন তো আর সব ব্যাপারে হাত পেতে টাকা চাওয়া যায় না।

দরজা খুলতেই এক এক লাফে দু'দুটো সিঁড়ি ভেঙে সটান নিজের ঘরে

চলে এলো। প্রীতি শুয়ে একটা সিনেমার কাগজ পড়ছিল।

ধড়মড় করে উঠে ব্যগ্র গলায় প্রশ্ন করলো, বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা হ'ল ?

ধ্রুব উজ্জ্বল মুখ নিয়ে রসিদটা প'কেট থেকে বের করে দেখালো।—ফাইনাল। একেবারে রসিদ নিয়ে এসেছি।

প্রীতির মুখেও উজ্জ্বল হাসি। যেন এতদিন বাদে সত্যি সত্যি যুদ্ধ জয় করেছে।

তারপরই ধ্রুব বললে, একটা অবাক কাণ্ড, তোমাকে তো আসল কথাটাই বলা হয়নি।

প্রীতির চোখে প্রশ্ন।

ধ্রুব হাসতে হাসতে বললে, বাড়িওয়ালা তো চেনা লোক, খুব চেনা। ঐ সামনের ফ্ল্যাট বাড়িটা হওয়ার আগে···

কথাটা বলে ফেলে ধ্রুবর নিজেরই কেমন খারাপ লাগলো। চেনা লোক, খুব চেনা। সত্যি কি তাই ?

কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল ওর গলার স্বর।—জানো প্রীতি, মাত্র একখানা না দেড়খানা অন্ধকূপ ঘর নিয়ে থাকতো একটা গোটা সংসার। এখন ফেঁপেফুলে বড়লোক হয়ে গেছে। কিসের ব্যবসা কে জানে।

চেনা লোক বলার অধিকার কি ধ্রুবর আছে! ও তো লোকটিকে এড়িয়ে এড়িয়ে যেত। লুঙ্গি পরে ফতুয়া গায়ে দিয়ে থলি হাতে করে যখন বাজার যেত, ডেকে কথা বললেও ধ্রুব এড়িয়ে যেত। যেন পাড়ার কেউ দেখলে ওর নিজেরও দাম কমে যাবে। ওর ট্রাউজার্সের কাপড় যে বেশ দামী, কেউ ভাববে না। অথচ এখন তাকেই খুব চেনা লোক হিসেবে স্বীকার করতে একটুও অস্বস্তি হচ্ছে না।

ধ্রুবর মনে হয়েছিল ও যুদ্ধজয় করে ফিরছে। এখন আর তেমন মনে হচ্ছে না।

শুনলে বাবার হয়তো একটু সম্মানে লাগবে। দাদাদের বৌদিদের।

আশ্চর্য, ভাগ্য এক একজন মানুষকে কত তাড়াতাড়ি বদলে দিতে পারে।

কিন্তু একে কি যুদ্ধজয় বলে। এতদিন তো ওর সামনে ছিল আত্মসম্মানের প্রশ্ন। সে আত্মসম্মান শুধু নিজের পরিবারের কাছে, দাদা

বৌদিদের কাছে, তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে।

খুব অহঙ্কার নিয়ে বলেছিল, এত অশান্তি নিয়ে থাকা যায় না। আমরা উঠে যাচ্ছি।

কথা রাখতে পেরেছে, একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করে তাদের চোখের সামনে দিয়ে সদর্পে উঠে যাবে, সেটাই যেন যুদ্ধজয়।

অথচ এটা যে কত বড় পরাজয় ধ্রুব এতক্ষণ ভেবে দেখেনি। পরাজয় একটা নগণ্য মানুষের কাছে। দীনদরিদ্র দুঃস্থ মানুষ বলে মনে হত, ধ্রুবদের সঙ্গে কথা বলতে পেলেই ধন্য মনে করতো। দু' লাইন ইংরিজি লিখতে পারে না। রসিদে সইটা দেখেই হাসি পেয়ে গিয়েছিল।

উপমন্ত্রীকে গ্রামের স্কুলে নিয়ে যাবে, একটা অভিনন্দনপত্র লিখে দেবেন ইংরিজিতে ! কাকে কি ভাবে তোয়াজ করতে হয়, ঠিক জানে। হাসতে হাসতে বলেছিল, না না, ইংরিজি। ইংরিজিতে হলেই ওঁরা খুব খুশি হন। ছাপার অক্ষরে ইংরিজিতে নিজের নাম, বুঝলেন কিনা !

প্রীতি সব শুনে বলে উঠলো, তা হোক্। তারপরই হেসে বললে, দেখো, এবার ওর ব্যবসার চিঠিপত্র সব না তোমাকে দিয়ে লেখাতে আসে।

ধ্রুবও হাসলো।

মাকে গিয়ে বললো, আমরা চলে যাচ্ছি, ফ্ল্যাট পেয়ে গেছি।

মা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালেন।—সত্যি চলে যাবি ?

মা'র মুখ দেখে মনে হ'ল যত রাগারাগি করেই ও সেদিন বলে থাকুক, মা একটুও বিশ্বাস করেননি। দু'মাস ধরে ও ফ্ল্যাট খুঁজছে বটে, কিন্তু ও-সব নিয়ে আর তো কথা হয়নি ; তাই ভেবেছিলেন, ওটা রাগের কথা, সত্যি চলে যাবে না।

—ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কোন সংসারে ঝগড়াঝাঁটি হয় না।

মা এসে প্রীতিকে ধরলেন, ছোটবৌমা, তুমিই একটু বুঝিয়ে বলো।

প্রীতি কোন কথা বললো না। ও তখন একটা সজারু হয়ে আছে, সর্বাঙ্গে কাঁটা ফুলিয়ে। কেউ না গায়ে হাত দিয়ে একটু আদর করে ফেলে।

শেষ পর্যন্ত মা বুঝতে পারলেন ও-সবে কিছু হবে না।

তাই ধীরে ধীরে বললেন, তোর বাবাকে একটা ভাল দিন দেখে দিতে

বলিস। তোর সংসারের মঙ্গলও তো আমাকেই ভাবতে হবে।

অর্থাৎ পাঁজি দেখিয়ে দিনস্থির করতে হবে। ওসবে ধ্রুবর কোন বিশ্বাস নেই, প্রীতিরও না। তবু মনটা কেমন নরম হ'ল। বললে, তুমিই ব'লো।

মা'র এ ইচ্ছেটা অন্তত রাখতে চাইলো। ও কি, নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়ার আগে ওদেরও ভয়-ভয় করছিল। এতদিন ধরে এখানে আছে, মাথার ওপর বাবা-মা। পাড়াটাও রক্তমাংসের সঙ্গে মিশে গেছে।

এখন তো যেতে হবে একেবারে নতুন পরিবেশে। বিপদ-আপদ অসুখ-বিসুখে এখন আর কারও ওপর ভরসা করা চলবে না।

টিপুর হঠাৎ একদিন একেবারে একশো-তিন জ্বর। ধ্রুব বাড়ি ছিল না। প্রীতি এপাড়ার কোন ডাক্তারকেই চিনতো না। দাদা অফিস থেকে ফিরে যেই শুনলো, পোশাক না বদলেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার নিয়ে এসেছিল। প্রীতি তখন উদ্ভ্রান্ত, ডাক্তারের কথায় ঠাণ্ডা জল নিয়ে টিপুর মাথা ধুইয়ে দিতেই ব্যস্ত। ডাক্তারকে ফি দেওয়ার কথা মনে ছিল না।

ধ্রুব এসে সব শুনে জিগ্যেস করলো, ডাক্তারের ফি কে দিল ?

—তা তো জানি না। এই যা ! আমি তো দিতে ভুলেই গেছি।

ধ্রুব দাদাকে টাকাটা দিতে গিয়েছিল। দাদা হেসে ফেলেছিল। —তুই কি রে ? টিপু কি আমাদের পর ?

টাকা নেয়নি।

অথচ এদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ। একটা ফ্ল্যাট পেয়ে আলাদা হতে পারছে বলে ভাবছে যুদ্ধজয় করেছি।

দিনকয়েক পরে মা এসে তারিখটা বললেন।—তোর বাবা বলছিল, এ মাসে তেমন ভাল দিন নেই। সাতাশে ফাল্গুন, একটা অবধি বারবেলা, তার পর।

ধ্রুব বললে, আচ্ছা।

ও বাবার সামনে যেতেই পারছিল না। সেদিন প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল বলেই বলতে পেরেছে। এখন আর সম্ভব নয়। সেজন্যই মাকে বলেছে, তুমি বলো। মাকে বলতেও খুব কষ্ট হয়েছে ধ্রুবর। মা-বাবার কি দোষ। ওঁরাও তো ধ্রুবর মতই, কিংবা ধ্রুবর চেয়েও অনেক বেশি ভিতরে ভিতরে ছিন্নভিন্ন হচ্ছেন। দোটানার মধ্যে ভিতরে ভিতরে পুড়ছেন। ওঁরা তো

আর বিচারকের আসনে বসতে পারেন না, যে কার দোষ সেটাই বিচার করবেন।

মা আক্ষেপের স্বরে একদিন বলেছিলেন, কার দোষ ? আমার কপালের দোষ রে, আর কারও দোষ নয়।

এ-সব কথা শুনলে বড় ব্যথা লাগে, মন খারাপ হয়ে যায়। বাবার চাপা কষ্টের মুখ কিংবা মা'র দীর্ঘশ্বাস মাখানো কথা যখন ধ্রুবর বুকের ভিতরটা নিঙড়ে দেয়, তখনও তা প্রীতিকে স্পর্শ করে না। অন্তত ধ্রুবর তাই মনে হয়।

অবশ্য কেন তা স্পর্শ করবে প্রীতিকে। ধ্রুবর সঙ্গে ওঁদের সম্পর্কটা জন্ম থেকে। প্রীতি তো সম্পর্ক গড়ে তোলারই সময় পেল না, দিল না। তার জন্যে দোষও দিতে পারে না। ধ্রুবই কি কোনদিন বুঝতে চেয়েছে, ওর নিজের বাবা-মাকে ছেড়ে প্রীতির এ-বাড়িতে আসার সময় প্রীতির ভিতরটা কতখানি ছিন্নভিন্ন হয়েছিল ? কেউ বুঝতে পেরেছে ? বুঝতে চেয়েছে ? দাদা, মেজদা, ও নিজে ? কেউ না।

মেজবৌদি এই সেদিন তার বাবা-মা'র কাছে গিয়ে দিনকয়েক থাকবে বলেছিল।

মেজদা রেগে গিয়ে ধমক দিয়েছিল—তোমার তো এ-বাড়িতে থাকতেই ইচ্ছে করে না, সুযোগ পেলেই কেবল বাপের বাড়ি যাবো।

ধ্রুবরও শুনে খারাপ লেগেছিল। বাবা মা যেন শুধু ছেলেদের, মেয়েদের বাবা মা যেন সত্যি সত্যি বাবা মা নয়। কই, তাদের বুকের ভিতরটা কি ভাবে ছিঁড়ে যায় আমরা তো ভেবে দেখি না। আমরাই তো ওদের স্বার্থপর করে তুলি। ওরা হয়তো মনে মনে বলে, আমার আজন্ম সম্পর্কটা যদি এতই তুচ্ছ, যদি তোমার জন্যে ছিঁড়ে ফেলতে হয়, তা হ'লে তোমার জন্মসূত্রের স্নেহ ভালবাসাই বা তুমি ছিঁড়ে ফেলবে না কেন।

ধ্রুব তো মনে মনে ভেবে দেখেছে, মা তো এত ভাল, প্রীতিকে এত ভালবাসেন, কিন্তু ওর যে একটা আলাদা পছন্দ থাকতে পারে, রুচি থাকতে পারে, সে কথা মনে রাখেন না কেন ? যেন মা যা চায়, যা ভাল মনে করে, সেটাই ঠিক। বাড়ির বউ হয়ে এসেছো, তোমার সমস্ত অস্তিত্ব ডুবিয়ে দিতে হবে। কেন ? মাকে দোষ দিয়ে কি হবে, ধ্রুব নিজেও তো সে-রকমই ভাবে। ঠাণ্ডা মাথায় যখন ভাবে তখন বুঝতে পারে প্রীতির,

মানে প্রীতিদের কি অসীম সহ্যশক্তি।

—হোয়াইট ওয়াশের কথাটা কিন্তু বলে আসতে ভুলো না।

প্রীতি মনে পড়িয়ে দিয়েছিল।—আর তালাচাবি নিয়ে গিয়ে দরজায় লাগিয়ে দিয়ে আসতে হবে। বাড়িওয়ালাদের কিচ্ছু বলা যায় না।

ধ্রুব হেসে বলেছে, না না, সকলে কি একই রকম নাকি ? রাখালবাবু দারুণ ভালমানুষ, আমরাই আগে বুঝতে পারিনি।

বুঝতে সত্যিই পারেনি কেউ। কত সাদাসিধে ভাবে থাকতেন ওঁদের সামনের বাড়ির একতলায়। এত বড় একখানা বাড়ি হাঁকিয়ে বসবেন কোনদিন ভাবেনি কেউ। ধ্রুব অবশ্য বাড়ির কাউকেই বলবে না। ওরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু সম্মানেও লাগবে।

বড় বৌদি হয়তো বলে বসবে, ঐ লোকটাকে তোমরা অত হতশ্রদ্ধা করতে, তারই বাড়ির একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে তোমার লজ্জা করলো না।

ঘরগুলো চুনকাম করিয়ে দেওয়ার কথা বলার জন্যেই ধ্রুব গেল একদিন। এমন কিছু রাত হয়নি তখন।

গোঁপওয়ালা পালোয়ান টাইপের দারোয়ানকে বললে, বাবুকে একবার খবর দাও, দেখা করবো।

দারোয়ান বললে, সকালে আসবেন।

ধ্রুব বললে, তুমি গিয়ে খবরই দাও না। বলো, ধ্রুববাবু এসেছেন। বলবে, ধ্রুববাবু। যিনি ঐ ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন।

দারোয়ান অখুশি মুখ করে বললে, টহরিয়ে।

একটু পরেই ওপর থেকে নেমে এসে বললে, বাবু শুয়ে পড়েছেন।

ধ্রুবর বিশ্বাস হ'ল না। এত তাড়াতাড়ি কেউ শুয়ে পড়তে পারে না। তা হ'লে কি ইচ্ছে করেই দেখা করলেন না রাখালবাবু ? এতখানি হেঁটে এসেছে ও, আবার ফিরে যেতে হবে। আবার আসতে হবে কাল। অথচ দু'মিনিটের তো কথা।

ধ্রুবর রীতিমত অপমান লাগলো। প্রীতি ঠিকই বলেছে। বাড়িওয়ালা হলেই বোধহয় এইরকম হয়ে যায়। ভাড়াটের সুখসুবিধে, সম্মান-অসম্মান যেন কিছুই নয়।

রাগ চেপে ধ্রুব বললে, কাল আর আসতে পারবো না হয়তো, তুমি বলে দিও ঘরগুলো চুনকাম করিয়ে দিতে। আসলে দারোয়ানের কাছে

আত্মসম্মান রাখার জন্যেই বলতে হল, কাল আসতে পারবো না।

দারোয়ান ঘাড় নেড়ে বললে, আচ্ছা বাবুজী।

ধ্রুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে আসছিল। দারোয়ান হাসলো।—রাতমে বাবুর সঙ্গে মোলাকাত হয় না বাবুজী। ওর হাসিটা কেমন রহস্যজনক।

—কেন ? ধ্রুব প্রশ্ন করলো।

দারোয়ান হাসতে হাসতে হাতটা মুখের কাছে তুলে গ্লাসে চুমুক দেওয়ার ভঙ্গি করলে।

তাই বুঝি !

রাখালবাবু তা হ'লে টাকাই করেননি, এই গুণটাও হয়েছে। না কি আগে থেকেই ছিল, ওরা জানতো না।

এতক্ষণ ওর অপমান লাগছিল, মুহূর্তে তা ধুয়েমুছে গেল। কিন্তু প্রীতি আবার এ-কথা শুনলে বেঁকে বসবে না তো ? হয়তো বলে বসবে, একটা মাতালের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলছো !

না, প্রীতিকে বলার দরকার নেই।

আসলে রাখালবাবু লোকটাই একটা রহস্য। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধ্রুব কবে এতটুকু উপকার করেছিল, তার জন্যে আজও কৃতজ্ঞ। কোন কোম্পানি, কত মাইনে কিছুই জিগ্যেস করেনি। অথচ হাতকাটা দালালটা কত ভয় দেখিয়েছিল। জিগ্যেস তো করেইনি, উপরন্তু পঞ্চাশটা টাকা ফিরিয়ে দিল। প্রথমে হয়তো লোভে পড়ে সব টাকাটাই পকেটে ঢুকিয়েছিল, পরে কিছু মনে হতে ফেরত দিয়েছে।

কিসের ব্যবসা ভদ্রলোকের ধ্রুব জানে না। যখন ওদের বাড়ির সামনের একতলায় থাকতো, তখন কোন কোনদিন দেখতো, অনেক রাতে, রাত এগারোটা কি বারোটা, অন্ধকারে একটা ঠ্যালা গাড়ি এসে দাঁড়াতো। বিরাট বড় বড় পিপের মত ড্রাম, তিনটে কি চারটে—কুলিদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে রাখালবাবু সেগুলো বাড়ির ভিতর ঢোকাতেন। আবার আরেকদিন একটা ঠ্যালা গাড়ি আসতো, ড্রামগুলো নিয়ে চলে যেত। সেও ঐ মধ্যরাত্রে।

ওরা নিজেরা বলাবলি করতো। ড্রাম তোলা নামানোর শব্দে প্রায়ই ঘুম ভেঙে যেত ওদের। বারান্দায় গিয়ে কোন কোনদিন দাঁড়িয়ে দেখতো। কিন্তু ঐ ড্রামগুলোর ভিতরে কি আছে কেউ জানতো না।

ধ্রুব আজও জানে না।

ওসব জানার ওর প্রয়োজনও নেই। এখন একটাই কাজ, ইলেকট্রিকের মিটার নিজের নামে করাতে হবে। বাড়ি বদলাতে গেলে কত রকম ঝামেলা। আরেকটা কাজ লরি জোগাড় করা। দিনে দিনে তো কম আসবাবপত্র জমা হয়নি। খাট, আলমারি, আয়না, বুককেস, আরো হাজার রকম টুকিটাকি। জমতে জমতে এমন অবস্থা, ঘরে পা ফেলার জায়গা নেই। তা হোক্, ওখানে গিয়ে আর এত অসুবিধে হবে না, তিন তিনখানা ঘর, দিব্যি ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যাবে।

তবে সময় থাকতে থাকতে লরির ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। কোথায় পাওয়া যায় কে জানে। অফিসে কাউকে জিগ্যেস করে দেখবে। কিন্তু লরির চেয়ে বেশি চিন্তা কুলিদের নিয়ে। ট্রেন্‌ড্ কুলি না হ'লে হয়তো কাচফাঁচ ভেঙে কেলেঙ্কারি করে বসবে।

প্রীতি একসময় বললে, এই বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, সেই হাতকাটা দালালটা টাকার তাগাদায় এসেছিল।

—ও হ্যাঁ, ওকে তো আবার এক মাসের ভাড়া দিতে হবে।

প্রীতি হেসে বললে,না, বাড়িওয়ালা কমিয়ে দিয়েছে বলে ও ছাড়বে না, বলেছে পুরো সাড়ে চারশোই দিতে হবে।

কথাটা শুনে ধ্রুব একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল, তবু বললে, তাই দেবো।

আসলে লোকটা তো আমাদের উপকারই করেছে, ও না থাকলে তো যোগাযোগ হ'ত না. এর আগে তো এক জায়গায় মোটামুটি পছন্দও হয়েছিল, কিন্তু বাড়িওয়ালার কত রকম ফিরিস্তি। চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েও এত কথা বলতে হয়নি। সে জায়গায় এখানে তো কিছুই বলতে হ'ল না। সেজন্যে ও লোকটার কাছে কৃতজ্ঞ।

কিন্তু, যে লোকটা এমন একটা উপকার করলো, প্রথম থেকে আজ এখন অবধি সে একজন হাতকাটা দালাল হয়েই রয়েছে। পঞ্চাশটা টাকা বেশি দিতে হবে বলে মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল লোকটা কি লোভী। আশ্চর্য, ওর তো একটা নাম আছে, কোনদিন জিগ্যেস করতেও ইচ্ছে হয়নি। একজন দুঃখী লোক, নামমাত্র উপার্জন, কোন দুর্ঘটনায় হয়তো হাতটা কাটা গেছে, তার পরিচয় হয়ে গেল হাতকাটা দালাল। নামটা জেনে নিলে নাম ধরেই তো ওরা কথা বলতে পারতো। ধ্রুবর মনে হ'ল, আমরা কি স্বার্থপর, বোধহয় প্রথম থেকেই ভেবে নিয়েছি ফ্ল্যাট পেলেই

ওর দালালির টাকাটা দিয়ে বিদেয় করে দেবো, তার আবার নাম জানার কি দরকার। কিংবা লোকটা হয়তো নাম বলেও ছিল, মনে রাখা প্রয়োজন মনে করেনি। পঞ্চাশটা টাকা তাকে বেশি দিতে হচ্ছে বলে এখন গায়ে লাগছে!

—তোকে একটা কথা বলছিলাম…

মা এসে চুপ করে দাঁড়ালেন।

আসলে মা'র তো খুবই খারাপ লাগছে। হয়তো আবার বলে বসবেন থেকে গেলেই ভাল করতিস'; অথবা ঐ রকম কিছু, এই আশঙ্কায় ধ্রুব একটু কঠিন স্বরে বললে, কি বলছো বলো না।'

মা ধীরে ধীরে বললেন, তোরা তো এ-সব কিছু মানিস না, তবু আমার কথা ভেবে, বলছিলাম কি, যাবার আগে তোদের ফ্ল্যাটে যদি সত্যিনারাণ দিস।

একটু থেমে বললেন, ছোটবৌমা তো ওসব জানে না, আমি বলছিলাম, যদি আমি গিয়ে ওখানে ওসব দেবার ব্যবস্থাটা করে দিই……

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি একটু মনে শান্তি পেতাম আর কি।

ধ্রুব একবার প্রীতির মুখের দিকে তাকালো। ও চাইছিল প্রীতি খুশি হয়ে মাকে বলুক, হ্যাঁ মা, আপনি গিয়ে দেখেশুনে দেবেন, পুজোআর্চার আমি তো কিছুই জানি না…

কিন্তু না, প্রীতি যেন কি একটা কাজে বড় ব্যস্ত, শুনতেই পায়নি।

তাই ধ্রুবই বললে, হ্যাঁ তা তো দিতে হবেই, তুমি যদি পারো মা, খুব ভাল হয়।

মা হাসলেন।—পারবো না কি রে। যেন খুব খুশি হয়েছেন ধ্রুব ওঁর কথায় সায় দিয়েছে বলে। বললেন, আমি মরতে মরতেও তোদের জন্যে সব পারবো।

মা হাসতে হাসতেই বললেন, কিন্তু চলে যাবার সময়, ধ্রুবর মনে হ'ল, মা যেন চোখে আঁচল ঘসলেন।

ওর মনের ভিতরটায় একটা বিষাদের ছায়া পড়লো। এ বড় যন্ত্রণা। কষ্টও হয়, অথচ যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে, ছেড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ও এবং প্রীতি যেভাবে বাঁচতে চায়, এখানে সেভাবে বাঁচা যাবে না। সমস্ত

বন্ধনগুলো একে একে ছিঁড়ে গেছে। যেন অনেকদিন ধরে হাতকড়া পরানো ছিল, হাতকড়া খুলে ফেলে মনে হচ্ছে আমি মুক্ত, আমি আর বন্দী নই, কিন্তু হাতের কব্জিতে এখনও যেন হাতকড়ার স্পর্শটা লেগে রয়েছে। মনেই হচ্ছে না ওটা খুলে ফেলেছে।

বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় চলছে, কাউকে না বলেও যেন শান্তি নেই। অথচ এ-সব কথা প্রীতিকে বলা যাবে না। ও শুনলে উপহাস করবে, কিংবা কথায় বিছুটি মাখিয়ে বলবে, তা হ'লে বৌদিদের আঁচল জড়িয়েই থাকো, এতই যখন ছেড়ে যেতে কষ্ট।

অফিসে গিয়ে অবিনাশকেই বললে। ওর সঙ্গেই তো অন্তরঙ্গতা। জীবনের অনেক কথাই ওকে বলতে পেরেছে। কিন্তু ঘরোয়া টানাপোড়েনের খবর একটুও জানতে দেয়নি। বলতে লজ্জা। সঙ্কোচ। যেন বললেই অবিনাশের চোখে ও ছোট হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললো।—বড় অশান্তির মধ্যে দিন কাটছে ভাই। জয়েন্ট ফ্যামিলির মত খারাপ জিনিস আর নেই।

অবিনাশ হো হো করে হেসে উঠলো।—তোমাদের আবার জয়েন্ট ফ্যামিলি কোথায় হে। বাবা মাকে নিয়ে তিন ভাইয়ের সংসার, একে কি জয়েন্ট ফ্যামিলি বলে।

হাসতে হাসতে বললে, যেতে আমাদের হুগলির গ্রামের বাড়িতে, এখন নয়, বছর দশেক আগে, দেখতে কাকে যৌথপরিবার বলে।

একটু থেমে বললে, রান্নাঘর মানে টাটা কোম্পানির ফার্নেস, দাউ দাউ জ্বলছে সব সময়।

অবাক হয়ে গেল ধ্রুব। আগে কখনো শোনেনি ওর কাছে।

হেসে ফেলে বললে, তাই নাকি ?

অবিনাশ বললে, একটা বড় বারান্দায় লাইন দিয়ে দু'পাশে বাইশজন খেতে বসতে পারে। সব মেঝেতে, আসন নয় হে, গোটা কয়েক কম্বল আধ ভাঁজ করে।

—বাইশজন আর এমন কি! ধ্রুব এবার আর অবাক হ'ল না।

অবিনাশ হাসলো। —শুনবে তো সবটা।

একটা কাঁসর বাজানো হ'ত খাবার সময় হলে। গ্রামে যে যেখানে আছে। পরিবারের লোক, শুনেই চলে আসবে। তার আবার ফার্স্ট বেল,

সেকেন্ড বেল, থার্ড বেল।

এবার সত্যিই অবাক হতে হ'ল ধ্রুবকে।

অবিনাশ বললে, ফার্স্ট বেল বাচ্চাদের জন্যে, বিলো ফোর্টিন, ছেলেমেয়েদের সব। সেকেন্ড বেল পুরুষদের, ফর অ্যাডাল্ট মেল মেম্বার্স। থার্ড বেল মেয়েদের, সে প্রায় বেলা তিনটেয়।

ব'লে হো হো করে হাসলো।—পুজোর সময় সে এক এলাহি কাণ্ড, যে যেখানে আছে সব আসতো, ছেলে মেয়ে জামাই নন্দাই।

এখনও আছে? ধ্রুব জিগ্যেস করলো।

অবিনাশ হেসে বললে, দশ বছর আগেও ছিল। প্রথম পৃথক হলেন জ্যাঠামশাই, তারপর একে একে সকলেই। লাস্ট আমি, কোলকাতায় সংসার নিয়ে চলে এলাম। বাবা মা সেই গ্রামেই, মাঝে মাঝে আসেন। ও সব আর চলে না হে, চলে না।নিকুচি করো তোমার ঐ জয়েণ্ট ফ্যামিলির। মার সারাটা জীবন তো কেটেছে ঐ রান্নাঘরে, বউটাকে হাড় জিলজিলে করে দিয়েছিল, পালিয়ে এসে বেঁচেছি। বউয়ের কোন সাধআহ্লাদ থাকবে না, ভালবাসা মানে রাতে একসঙ্গে শোয়া! ধুত্তোর।

ধ্রুবর সঙ্কোচ কেটে গেল। যতখানি না বললে নয় সেটুকুই বললো। তারপর জানালো, ফ্ল্যাট পেয়েছে। কিন্তু বড় কষ্ট।

অবিনাশ গম্ভীর হয়ে বললে, হবেই তো। বলে কেমন আনমনা হয়ে গেল, যেন কিছু মনে পড়ে গেছে। যেন ওর চোখের সামনে কিছু ভেসে উঠছে, কোন স্মৃতি। মুখের ওপর কি ওটা বেদনার ছাপ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে অবিনাশ। ধীরে ধীরে বললে, জন্মের পর যখন নাড়ি কাটে তখন শিশু কিছু টের পায় কিনা কে জানে। কিন্তু এতকাল এক সংসারে কাটিয়ে আবার নাড়ি কাটা, কষ্ট হবে না? কিন্তু উপায় নেই ধ্রুব, সব মেনে নিতে হয়। একদিকে অনেক কিছু ছাড়তে হয়, আবার অনেক কিছু পাওয়াও তো যায়। নিজের মত করে বাঁচতে কে না চায় বলো।

একটু থেমে বললে, ভালই করেছো। সাহস করে চলে যাও, দিব্যি ভাল থাকবে। দেখবে দূরে থাকলেই আরো আপন মনে হবে।

অবিনাশের কাছে সমর্থন পেয়ে ধ্রুবর মনের অপরাধবোধ অনেকখানি সরে গেল। যেন নিজেই নিজেকে বোঝাতে চাইছে এ-ভাবে বললে, ভেবে কি হবে বলো, এটাই এ-যুগের নিয়ম।

অবিনাশ সায় দিয়ে বললে, হিউম্যান নেচার। সব ব্যাপারে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে হাতজোড় করে দাঁড়ানো, সে যে কি দিন ছেলেবেলায় দেখেছি। স্বাধীনতার চেয়ে দামী জিনিস আর কিছু নেই, বুঝলে ধ্রুব। বাবা-মাও তার কাছে তুচ্ছ।

অবিনাশই লরির ব্যবস্থা করে দিল।

চুনকাম হয়ে যেতেই মা গিয়ে সত্যনারায়ণ পুজো দিয়ে এলেন। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল ধ্রুব আর প্রীতি।

পুরুতঠাকুর দেখে বললেন, বাঃ এ তো চমৎকার ফ্ল্যাট।

মা বললেন, হ্যাঁ, ভালই।

পুজোর বাসনকোসন কোশাকুশি সব মা নিয়ে গিয়েছিলেন। পিতলের গামলায় খুব যত্ন করে সিন্নি বানালেন।

প্রীতি বেশ খুশি। ও মাকে সাহায্য করছিল, হেসে হেসে গল্প করছিল। দেখে ভাল লাগছিল ধ্রুবর। কিন্তু বুকের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধছিল একটাই কথা। কি অকৃতজ্ঞ, কি অকৃতজ্ঞ।

রাখালবাবু লোকটার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। বরং তাচ্ছিল্যই করতো তাকে। তবু, কবে সামান্য একটা উপকার করেছে ধ্রুব, বিরক্তির সঙ্গে, চাপা রাগের সঙ্গে তুচ্ছ একটা উপকাব করতে বাধ্য হয়েছিল, অথচ রাখালবাবু কৃতজ্ঞতা দেখালেন, একটাও প্রশ্ন না করে ওকেই ফ্ল্যাট ভাড়া দিলেন, উপরন্তু পঞ্চাশ টাকা ফেরতও দিলেন। 'তোমার সামনের ফ্ল্যাটও চারশোই দেয়'।

আর ধ্রুব দিব্যি সব ভুলে যেতে পারলো। এমন কি-আর অসুবিধে কিংবা অশান্তি ! ও চলে আসার পর বাবা-মা যা কষ্ট পাবেন, যে অশান্তিতে ভুগবেন তার তুলনায় কতটুকু। তবু সব ভুলে যেতে পারলো ধ্রুব।

বেশ কয়েকবছর আগের একটা দৃশ্য মনে পড়তেই নিজেকে ভীষণ ছোট লাগে। অনুশোচনা হয়।

মা এসে ধ্রুবকে বললেন, তোর বাবা ডাকছে। আয়।

এর আগেও একবার ডেকে গিয়েছিলেন। ধ্রুব তেমন গা করেনি। আজকাল বাবার ডাক মানেই তো ফালতু আজেবাজে কথা। বড় বেশি কথা বলেন আজকাল, এমন সব কথা যার সম্পর্কে ধ্রুবর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

দ্বিতীয়বার মা ডাক দিয়ে যেতেই বড়বৌদি এসে বললে, কি ব্যাপার বলো তো ? তিন ভাইকেই একসঙ্গে ডাকছেন ?

ধ্রুব ঠোঁট ওল্টালো। অর্থাৎ কি জানি। কিন্তু ওদের তিন ভাইকেই একসঙ্গে ডেকেছেন জেনে একটু কৌতূহলও হ'ল।

গিয়ে দেখলো মা একটা মোড়ায় বসেছেন, বাবা সেই হাতলওয়ালা আরাম কেদারায়। দাদা আর মেজদা দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, দুপ্রান্তে।

ঘরগুলো, বারান্দা চুনকাম হয়নি বহুদিন। এখানে ওখানে দাগ লেগে বেশ নোংরা হয়েছে, তাই এখন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় সবাই। বাড়িওয়ালা তো আজকাল হোয়াইট ওয়াশ করিয়ে দেয় না, তাই নিজেদের খরচেই করা হয়েছিল। প্রথম প্রথম তখন কত সাবধানতা, ঠিকে ঝি এসে দেয়ালে ঠেস দিলে সকলেই ধমক দিত। এখন নিজেরাই ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। আসলে নোংরা দেখলেই মানুষ নোংরা করতে চায়।

ধ্রুব কি করবে, সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইলো।

বাবা তাঁর তিন ছেলের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

বললেন, আমার বয়েস হয়েছে। ক'দিন আছি না আছি কেউ বলতে পারে না। তোর মা বলছে বেঁচে থাকতে থাকতে কিছু একটা ব্যবস্থা করে যেতে। পরে যাতে লাঠালাঠি না হয়।

ব'লে হাসলেন। বললেন, তোরা লাঠালাঠি করবি না তা জানি, তবু আমারও তো একটা দায়িত্ব আছে।

মা বলে উঠলেন, শোন তোরা, ওসব কথা নয়, তোর বাবা যদি আমাকে ফেলে পালায়, আমি বাপু ওসব টাকাপয়সা সইসাবুদ ওসব পারবো না। তাই বলছি···

কথাটা বাবাই শেষ করলেন। বললেন, আমার পেনশন আছে, তার চেয়েও বড় কথা তোরা তিন ভাই আছিস। আমাদের আর ভাবনা কিসের।

একটু থেমে বললেন, প্রভিডেন্ট ফান্ডে কিছু বেশি বেশি জমিয়েছিলাম। সুদে বেড়ে এখন প্রায় এক লাখ কুড়ি। তা এখনই তোদের তিনজনের নামে চল্লিশ হাজার করে ইউনিট কিনে দিতে চাই।

বাবা স্বেচ্ছায় কাণ্ডটা করছেন বলে ধ্রুবর অবশ্য মনে হ'ল না। মা'র প্ররোচনা। মা সই করতে খুব ভয় পান, যে কোন ফর্মেই হোক বা রেজিস্ট্রি চিঠির জন্যেই হোক। সব সময় বাবাকে জিগ্যেস করেন সই করবেন কিনা।

ধ্রুবর শুনে ভালই লেগেছিল, কিন্তু দাদা বোধহয় পিতৃভক্ত ভাল ছেলে সাজবার জন্যে ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করলে, এখনই ওসব নাই বা করলেন। সে পরের কথা পরে।

মা বললেন, হ্যাঁরে শেষদিন কি কারো নোটিস দিয়ে আসে ? যা কিছু আছে তা তো তোদের জন্যেই। আমাদের জন্যে তো তোরাই আছিস।

'আমাদের জন্যে তো তোরাই আছিস'। মনে পড়লেও এখন খারাপ লাগে। সেই চল্লিশ হাজার টাকা এখন প্রায় পঞ্চাশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। কিংবা আরো বেশি।

ও বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় এ-সব কথা মনেই পড়েনি। তখন শুধু সর্বাঙ্গে রাগ। এখন নিজেকে ছোট লাগে, অনুশোচনা হয়।

এখন সমস্ত ব্যাপারটা ঠাট্টার মত মনে হচ্ছে। মার অভিযোগ অনুযোগ কোন কিছুতেই কান দেয়নি। একটা নেশা তখন ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, নতুন ফ্ল্যাট, আলাদা ফ্ল্যাট। অথচ মা বুকের মধ্যে সব কষ্ট, সব অশান্তি চেপে রেখে এই ফ্ল্যাটে এসেছেন সত্যনারায়ণ দিতে। ধ্রুব আর প্রীতি যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে।

—তোদের মঙ্গল অমঙ্গল, টিপুর মঙ্গল অমঙ্গল, তোমরা যতই দূরে সরে যাও ছোটবৌমা, আমি তো নির্ভাবনা হতে পারবো না।

মা এমনভাবে কথাগুলো বলছিলেন যেন ভিক্ষে চাইছেন। জানেন, ধ্রুব আর প্রীতি ওসবে বিশ্বাস করে না, হয়তো মনে মনে অসন্তুষ্ট হচ্ছে এই ভেবে বলেছিলেন, শুধু একটা দিনের তো ঝামেলা, কয়েক ঘণ্টা, তোরা যাবার আগে অন্তত আমাকে পুজোটা দিতে দিস।

বাইরে একটা ফূর্তির ভাব রেখেছিল ধ্রুব। কিন্তু ভিতরে ভিতরে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। ও মা'র মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারছিল না। বাবার মুখের দিকেও তাকাতে পারেনি।

চলে আসার সময় কেবলই মনে হচ্ছিল যেন পালিয়ে যাচ্ছে।

লরি এলো নির্দিষ্ট দিনে। বাবা পাঁজি দেখে বলেছিলেন একটা পর্যন্ত

বারবেলা। কুলিদের বসিয়ে রেখেছিল কিছুক্ষণ। হাতের ঘড়িতে একটা বাজতেই তাদের মাল তুলতে বললে। তারা ঝটপট খাটটা খুলে ফেললো। আলমারি বুক কেস বসার চেয়ার সব একে একে লরিতে তুলতে শুরু করলো।

সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। কেউ কোন কথা বলছে না। যেন কারো মৃতদেহ পড়ে আছে উঠোনে, সবাই শোকে নিঃশব্দ।

ধ্রুবও মাথা তুলে কারো দিকে তাকাতে পারছে না। যেন সকলের কাছে ও ছোট হয়ে গেছে। অথচ তখন ভেবেছিল যুদ্ধজয়।

হেমন্তবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। সামনের সেই ভাঙা পোড়ো বাড়িটা আঁকড়ে ধরে পড়েছিলেন. ভিতরে ভিতরে যে নিঃস্ব হয়ে গেছেন কেউ জানতে পারেনি। গোপনে গোপনে বাড়িটা বেচে দিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়েছিলেন। সেও কি এই রকমই কোন লজ্জা!

—লোকটা কি বোকা. এত লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ি বিক্রি না করে যদি সকলকে জানিয়ে করতো. হয়তো অনেক বেশি দাম পেত। ধ্রুব বলেছিল।

ও জানতো না, দাম বেশি পাওয়ার চেয়েও দামী জিনিস কিছু আছে। আত্মসম্মান। পাড়ার এই এতগুলি লোকের সামনে ছোট হয়ে যেতে চাননি।

ধ্রুবর মনে হ'ল হেমন্তবাবুর মতই ও পালিয়েই যাচ্ছে।

যাবার আগে কি বাবাকে একটা প্রণাম কববে. বলবে. আমি যাচ্ছি!

সেটা যে কত কঠিন কাজ. ধ্রুব ভাবতে পারেনি।

প্রীতির ভাই গিয়ে লরিতে বসলো। বললে. তোমরা কিচ্ছু ভেবো না. আমি সব গোছগাছ করে দেব। তোমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসো।

ধ্রুব গিয়ে বাবাকে প্রণাম করলো। প্রীতিও।

বাবা মাথা তুললেন না। নিজের পায়ের দিকেই যেন তাকিয়ে আছেন।

'আমরা চলে যাচ্ছি' এ-কথাটাও বলতে পারলো না ধ্রুব। বলার তো কিছু নেই. নিজেই পাঁজি দেখে দিন বলে দিয়েছিলেন. মা সত্যনারায়ণ দিতে গিয়েছিলেন. তাও জানেন. লরিতে মালপত্র তোলা হচ্ছে দেখেছেন. অথবা শুনেছেন সিমলির কাছে।

ধ্রুব আর বাবার সামনে দাঁড়াতে পারছিল না. চলে আসছিল। বাবা

ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলেন, ছোটবৌমা। টিপুকে একবার দেবে, কোলে নেব।

ধ্রুবর বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা হ'ল। দাঁড়িয়ে পড়েছিল ও।

টিপু তো সারাক্ষণ বাবার কাছে কাছেই থাকতো। বাবার যত কথা ওর সঙ্গে। যত হাসি।

তা নিয়ে বড়বৌদি মেজবৌদি একটু টীকাটিপ্পনি করতেও ছাড়তো না।

মেজবৌদি বলেছিল, কই আমাদের ছেলেমেয়েদের তো কোনদিন এত আদর করতে দেখিনি।

ওসব ঈর্ষার কথা। ধ্রুবর সব মনে আছে, ওরাই ভুলে গেছে।

প্রীতি টিপুকে নিয়ে গিয়ে বাবার কোলে দিল।

উনি টিপুকে একেবারে বুকের ওপর চেপে ধরলেন, যেন একেবারে হৃৎপিণ্ডের ওপর। ধ্রুবর ভয় হ'ল, টিপুর ব্যথা লাগবে। একটা বাচ্চা ছেলেকে এমন করে কেউ চেপে ধরে নাকি।

ওর গালে থুতনি ঘষলেন। গালে গাল ঠেকালেন। তারপর টিপুকে ফিরিয়ে দিলেন প্রীতির কোলে। এমনভাবে হাত দু'খানা বাড়িয়ে ওকে ছেড়ে দিলেন, যেন চিরদিনের মত চলে যাচ্ছে।

আর তখনই প্রীতি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। ওর দু'চোখে জল।

ধ্রুব আর দাঁড়াতে পারছিল না। মাকে প্রণাম করেই তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এলো।

বড়বৌদি, মেজবৌদি, সিমলি সবাই তখন নীচে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

বড়বৌদি ধীরে ধীরে বললে, একেবারে পর করে দিও না ঠাকুরপো।

মেজবৌদি কান্না কান্না মুখে এগিয়ে এসে ধ্রুবর হাত ধরলো।—কাছেই তো রইলে ধ্রুবদা, এসো মাঝে মাঝে।

এতদিন ধ্রুবর মনে হয়েছে, সকলেই যেন শুধু বাঁধন ছিঁড়তে চাইছে। এখন মনে হচ্ছে, সবাই যেন বাঁধতে চাইছে। আর ও সেই বাঁধন ছিঁড়ে কিছুতেই বেরোতে পারছে না।

ধ্রুব বললে, প্রীতিকে দাঁড়াতে ব'লো। আমি ট্যাক্সি ডাকতে যাচ্ছি।

আশ্চর্য, ট্যাক্সিও যেন ওর সঙ্গে শত্রুতা করছে। একটুও সময় দিতে চায় না। বাড়ি থেকে বের হতে না হতেই হাতের কাছেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। সে যেতে রাজিও হ'ল।

নতুন ফ্ল্যাটে এসে উঠতেই মুহূর্তে সব যেন ধুয়েমুছে গেল।

আসবাবপত্র ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ওরা তিনজনই। ধ্রুব, প্রীতি, প্রীতির ভাই পুলক।

ডবল বেড খাটখানা খুলে আনা হয়েছে, ওটা প্রীতির বাবা মেয়ের বিয়েতে দিয়েছিলেন। ডবল বেডের চেয়েও একটু বেশি চওড়া। ভবিষ্যতে টিপু আসবে ভেবে নিয়েই অর্ডার দিয়ে বেশি চওড়া করিয়ে নিয়েছিলেন প্রীতির মা। ওঁর দূরদৃষ্টি আছে।

ওরা তিনজনে মিলে সেই খাটটা লাগালো শোবার ঘরের জানালা ঘেঁষে। তারপরও অনেকখানি জায়গা। খাটে গদি তোলা হ'ল ধস্তাধস্তি করে। তোষক বালিশ।

একটা বসার ঘরও হয়ে গেল। সেটায় আপাতত বুককেস, আলমারি। তৃতীয় ঘরখানাতেও সামান্য কিছু আসবাব।

ওখানে এই ক'খানা জিনিসেই ঘরটা ছিল একেবারে ঠাসা। পা ফেলার জায়গা নেই, যে আসতো সেই বলতো। ওদের নিজেদেরও শুনতে খারাপ লাগতো।

এখানে এসে একেবারে উল্টো।

পুলক প্রথম দেখেই বলেছিল, কত স্পেস রে প্রীতি। এত জায়গা নিয়ে কি করবি? দু'খানা ঘর হলেই তোদের চলে যেত।

প্রীতির দাদাও একটু সাবধানী প্রকৃতির মানুষ। সাড়ে চারশো টাকা ভাড়ার কথা শুনে বলেছিল, বাড়িভাড়াই দেবে সাড়ে চারশো, তা হ'লে খাবে কি!

তিন তিনখানা ঘর বেশ ফাঁকা ফাঁকা রয়েছে দেখে পুলকও বললে, দু'খানা ঘর হলেই চলে যেত।

ওদের তো সরকারী ফ্ল্যাট, ভাল জায়গায়, ভাড়াও নামমাত্র। তাই জানে না, এ বাজারে অর্ডার মত ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না। চারশো টাকাই মনে হচ্ছে দিব্যি সস্তা। দু' মাস ধরে ফ্ল্যাট খুঁজে খুঁজে তো হন্যে হয়ে গিয়েছিল ধ্রুব।

জিনিসপত্র সব কিছুটা গুছিয়ে রেখে প্রীতি মেঝের ওপরেই হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লো, কিছুটা ক্লান্তিতে।

তারপর ফুর্তিতে বলে উঠলো, আঃ, এতদিনে স্বাধীন হলাম।

ধ্রুবর নিজেরও সে-রকমই মনে হচ্ছিল, কিন্তু প্রীতির মুখে শুনতে ভাল

লাগলো না। বিশেষ করে পুলকের সামনে। এ ক'বছর আগের বাড়িতে প্রীতি কি খাঁচায় পোরা বন্দী হয়ে ছিল ! সেখানেও তো স্বাধীনই ছিল, শুধু মনে হয়নি স্বাধীন।

ধ্রুব আর পুলকও টিপুকে নিয়ে মেঝেতে বসে পড়লো।

ধ্রুবর মনে ফ্ল্যাট সম্পর্কে তখনও একটু অসন্তোষ লেগে আছে। আক্ষেপের সঙ্গে বললে, ব্যাটা দালালটা এত তাড়াহুড়ো করলো, আর আমরাও দু'জনই এসে দেখলাম, বাড়িটার যে দক্ষিণ একেবারে চাপা, খেয়ালই হয়নি।

পুলক বললো, একেবারে হাওয়া পাবে না।

প্রীতি ঐ দক্ষিণের ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চাইছিল। একটা পৃথক ফ্ল্যাটে উঠে আসতে পেরেছে, তাতেই সারা শরীরে ওর খুশি উপছে পড়ছে।

বললে, কোলকাতায় ক'খানা ফ্ল্যাটে হাওয়া-বাতাস খেলে ? দক্ষিণ খোলা হবে, বে অফ বেঙ্গলের হাওয়া খাবো, ওসব ভাবতে গেলে খাবার বেলাতেও হাওয়াই জুটবে।

ওরা দু'জনই হেসে উঠলো।

আর তখনই প্রীতি বলে বসলো। এবার বাবা হাউসকোট পরবো, আর কাউকে কেয়ার করি না।

ধ্রুব আর পুলক আবার হেসে উঠলো।

আসলে কার যে কোথায় লাগে, সামান্য একটা ইচ্ছে না মেটাতে পারলে মানুষ যে কত দুঃখী হয়, বন্দী ভাবে নিজেকে, বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। ধ্রুব জানে, প্রীতির ট্রাঙ্কের মধ্যে দু'দুখানা হাউসকোট একেবারে নতুন হয়েই পড়ে আছে। ও বাড়িতে হাউসকোট পরার সাহসই হয়নি প্রীতির। একদিন ধ্রুবকে জিগ্যেস করেছিল।—নিজের ঘরের মধ্যে পরলে কার কি বলার আছে !

ধ্রুব নিষেধ করেছিল। বাবা-মা কি মনে করবে। কিংবা ওঁরা কিছু না মনে করলেও বড়বৌদি তো ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে ছাড়বে না। উপরন্তু বাবা-মা'র বিরুদ্ধেও বিষোদ্গার করবে। 'এখন ছোটবৌমা যাই করুক, কোন আপত্তি নেই, অথচ আমার বেলায় পান থেকে চুন খসলেই...'

প্রীতি বুঝি একদিন মেজবৌদিকে চুপিচুপি বলেছিল হাউসকোট পরার কথা।

মেজবৌদি উৎসাহ দেখিয়েছিল।—পর না, কে কি বলবে ভাবছিস কেন। তারপর হেসে বলেছিল, তুই চালু করে দিলে আমিও পরবো।

কিন্তু ধ্রুব নিষেধ করেছিল বলে প্রীতি আর ওপথে যায়নি।

আশ্চর্য। এইসব ছোটখাটো ব্যাপারে বাবা-মাকে অসন্তুষ্ট করতে, আঘাত দিতে চায়নি ধ্রুব। প্রীতিও চেষ্টা করেছে মেনে চলতে। অথচ শেষ পর্যন্ত একটা বড় আঘাত দিতে বাধলো না। নিশ্চিন্তে ছেড়ে চলে এলো। এর চেয়ে ছোটখাটো বাধানিষেধগুলো তুচ্ছ করতে পারলে হয়তো বড় আঘাতটা দিতে হত না। অন্তত এত তাড়াতাড়ি দিতে হ'ত না।

একটা কেরোসিন স্টোভ কিনে রেখেছে প্রীতি, কেরোসিনও জমা করে রেখেছিল কিছু। বাসনকোসনও মোটামুটি চলে যাবার মত।

কিন্তু রান্নার পাট নেই এখন। প্রীতিদের বাড়িতে রাত্তিরে খাওয়ার কথা। ওরাও খুব একটা দূরে থাকে না। রাত্তিরে খেয়ে ফিরে আসবে, নাকি ওখানেই রাতটা কাটাবে, এখনও ঠিক করেনি।

প্রীতি বললে, গ্যাসের জন্যে নাম লেখাতে হবে। কবে পাবো কে জানে!

ধ্রুব হতাশ সুরে বললে, কোনটা যে আগে করি, কোনটা পরে। এত কাজ···

প্রীতি হাসলো। বললে, বসার ঘরের জন্যে শোফাকৌচ···

ধ্রুব বললে, আপাতত তিনটে বেতের চেয়ার হলেই হবে।

প্রীতির মনঃপূত হল না।—তুমি কি বারবার বদলাবে নাকি? কতগুলো টাকা জলে দিয়ে লাভ কি!

ধ্রুব চুপ করে রইলো। কোনটাকে যে জলে দেওয়া বলে ও বুঝতেই পারছে না।

কিন্তু দিনে দিনে বাড়িটার শ্রী ফিরে আসছিল। খুব সুন্দর করে সাজিয়ে নিচ্ছিল প্রীতি, বাড়িটা, অর্থাৎ এই তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাট। এখন তো এটাই বাড়ি।

প্রীতির বাবা-মা দু'দিন এলেন, অনেকক্ষণ থাকলেন, গল্পগুজব করলেন, টিপুকে আদর। দেখে মনে হচ্ছিল ওঁরাও খুব খুশি।

প্রীতির বাবা হাসতে হাসতে মেয়েকে বললেন, ইচ্ছে হলেই এবার থেকে তোর এখানে চলে আসবো।

একটু থেমে বললেন, যাই বলিস, তোদের আগের বাড়িতে যেতে কেমন সঙ্কোচ হত। ওঁরা খুবই ভালমানুষ, আমি গেলে খুব খুশি হতেন, আদর আপ্যায়ন করতেন, কিন্তু তবু...

ধ্রুবর নিজেরও সে-কথাই মনে হ'ল। আগের বাড়িতে প্রীতির বাবা-মা, কিংবা দাদা দিদি কেউ বেড়াতে গেলে, মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, ধ্রুবর ভালো লাগত। কিন্তু কেমন আড়ষ্ট লাগত। এখানে এঁদের যতখানি আপন মনে হচ্ছে, আপন করে নিতে পারছে, আগের বাড়িতে তা সম্ভব ছিল না। সব সময়েই কেমন একটা সঙ্কোচ। কিছুটা লজ্জা, কিছুটা ভয়। প্রীতির তো আরো বেশি। যেন সব ক'টা চোখ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, সব ক'টা কান সজাগ।

এখানে এখন সত্যি একটা মুক্তির হাওয়া।

প্রীতির মা নানা রকম উপদেশ দিচ্ছিলেন প্রীতিকে। ভাঁড়ারের জিনিসপত্র। কোথায় কিভাবে রাখবে, একটা মীটসেফ আনিয়ে নে, আরো কত কি।

বাড়িওয়ালা রাখালবাবুও খোঁজখবর নিতেন। সকালে মর্নিং ওয়াক করতে বেরোতেন। বেরোবার সময় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করতেন, ধ্রুব, কিছু অসুবিধে হচ্ছে না তো ? কিছু দরকার হলে ব'লো। একসঙ্গে আছি আমরা, বুঝলে কিনা...

হরিশ মুখার্জি রোডে থাকার সময় রাখালবাবু লুঙি পরে ফতুয়া গায়ে বাজারে যেতেন। হাতে থলি নিয়ে। এখন আর ওসব করেন না। চাকরবাকরদের হাতে বাজার তুলে দিয়েছেন। কিন্তু সকালে বাইরে একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরতে যেতেন বাজার করার নাম করে। এখন বাজার করা সাজে না, তাই মর্নিং ওয়াকে বের হন।

—তোমার তো গ্যাস স্টোভ নাই ! একদিন হঠাৎ বললেন, রিনা বলছিল। আমার একটা চেনা লোক আছে, করিয়ে দোবো, বুঝলে কিনা।

প্রীতি শুনে বললে, যাই বলো, সব বাড়িওয়ালা এক রকম নয়। রাখালবাবু লোকটি কিন্তু সত্যি খুব ভাল লোক।

রাখালবাবুর সংসার নিতান্ত ছোট নয়। দুই ছেলে, এক মেয়ে—রিনা।

ছোট ছোট তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে হরিশ মুখার্জি রোডের একতলার ঘরে কি করে থাকতেন কে জানে। আসলে ব্যবসার ব্যাপারটাই হয়তো এই রকম। প্রথম দিকে কষ্টেসৃষ্টে থেকে টাকা জমাতে হয়। তখন সবাই ভাবে লোকটা দুঃস্থ। তারপর হঠাৎ একদিন মুখোশ খুলে ফেলতেই সকলে অবাক হয়ে যায়।

কিন্তু তার জন্যে রাখালবাবু মানুষটা বদলে যাননি। কোন গর্ব নেই, ভাড়াটে বলে তাচ্ছিল্য করেন না। বরং ধ্রুবকে যেন একটু সমীহই করেন।

ধ্রুবর শুধু একটাই অনুশোচনা হয়। না জেনে মানুষটিকে দুঃখ দিয়ে ফেলেছে।

প্রীতিকে একদিন বলেছিল, ভদ্রলোক এত খোঁজখবর নেন, গ্যাসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, একদিন ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এসো।

প্রীতি হেসে বললে, যাবো। তবে গ্যাসের জন্যে ওঁর চিন্তাই বেশি, কেন জানো ? তা না হ'লে বাড়ি নষ্ট হবে যে। কয়লা কিংবা কেরোসিনে শেযে এত যত্নের বাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে কে চায় বলো।

এদিকটা ধ্রুব একবারও ভাবেনি। বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হ'ল না।

সেদিনই রাস্তায় রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা। উনি মর্নিং ওয়াক করে ফিরছেন। ওঁকে খুশি করার জন্যেই বললে, আপনার স্ত্রীকে তো একদিনও দেখলাম না, প্রীতি আজ যাবে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।

রাখালবাবু কথাটা শুনেই ধ্রুবর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

ধ্রুবর হাতটা ধরলেন, থর[illegible] করে যেন কাঁপছেন, বললেন, সে তো নেই ধ্রুব। আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছে। তিন তিনটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে...

গলা কাঁপছিল ওঁর। ছলছল চোখে বললেন, কি আর বলবো তোমাকে, তিনটে মাসও পার হ'ল না, শুধু বাড়িই করলাম আমি, সে ভোগ করতে পেল না ধ্রুব। বুঝলে কিনা, এ বাড়িতে আসার তিন মাসের মধ্যে...

ধ্রুব সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। অনুশোচনায় মনটাও খারাপ হয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে প্রীতিকে সে-কথা বলতেই ও বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো। হেসে বললে, দূর, তুমি কি শুনতে কি শুনেছো।

ধ্রুব বললে, ভুল শুনবো কেন, বললাম, তুমি ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। স্পষ্ট বললেন, গৃহপ্রবেশের তিন মাসের মধ্যেই মারা যান।

প্রীতি অবাক হয়ে বললে, কিন্তু ওঁর ছেলেমেয়েরা, রিনি বিল্টু ওরা তো এসেছিল, কত গল্প হ'ল। কিছু তো বলেনি। বরং মা মা বলে কি যেন বলছিল।

তারপর বললে, ওরা ভীষণ ভাল, জানো।

এটুকুই পরম তৃপ্তি। এতকাল আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে বাড়িওয়ালাদের সম্পর্কে কত কি শুনে এসেছে। খারাপ, খারাপ, বাড়িওয়ালা মানেই খারাপ লোক।

অফিসে অবিনাশকে আগেই বলেছিল একদিন, শুনে এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল যে প্রত্যেককে ডেকে ডেকে বলেছে, শুনুন শুনুন, বাড়িওয়ালা ভালোও হয়। ধ্রুবর বাড়িওয়ালা ওর মুখ দেখে এমন গলে গেছে যে পঞ্চাশটা টাকা ভাড়া কমিয়ে দিয়েছে।

অবিনাশকেই এসে বললে। রাখালবাবু মানুষটা একেবারে ভালোমানুষ। স্ত্রীকে বোধহয় খুবই ভালোবাসতেন। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন, বেচারী বউটা নতুন বাড়িটা ভোগ করতে পেল না ব'লে দুঃখ করছিলেন।

অবিনাশ বললে, তুমি খুব লাকি ধ্রুব। এ বাজারে এমন ভাল বাড়িওয়ালা পাওয়া পরম সৌভাগ্য। তুমি বরং একটা কাজ করো, একটা লটারির টিকিট কেটে ফেল, সময়টা তোমার খুবই ভাল যাচ্ছে।

ধ্রুব হাসলো। কিন্তু সত্যিই মনের মধ্যে একটা পরম তৃপ্তি। বাড়িওয়ালাকে নিয়ে কত লোকের কত ঝামেলা। নিত্যই তো শুনছে। ছোট মাসীদের তো মামলা চলছে। অফিসের বীরেশ্বরও সেদিন বলছিল, হাইকোর্টে ঝুলছে, নিত্যদিন উকিলের বাড়ি। তাছাড়া ওর আবার একটু ভয়ও আছে, রেন্ট কন্ট্রোলে ভাড়ার টাকা জমা দেওয়া নিয়ে কি যেন ভুলভ্রান্তি···

ধ্রুবকে অন্তত সে-সব কথা ভাবতে হবে না। তেমন অবস্থা হ'লে ও নিজেই ছেড়ে দেবে।

ভালমানুষ ! কিন্তু একটা লোক, একজন মানুষকে কি বিচার করে ভাল

বা মন্দ বলা যায় !

গলির মোড়ের বাড়ি থেকে যে ভদ্রলোক সেদিন বের হলেন, এখন নাম জেনে গেছে, অনাদিবাবু···মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখা হ'ত, হাসতেন, কখনও মুখ ফুটে 'ভাল ?', ধ্রুবও সংক্ষেপে সারতো।

কথায় কথায় একদিন জিগ্যেস করলেন, কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো !

তারপরই অনাদিবাবু বলে বসলেন, লোক সুবিধের নয় মশাই, আপনার ঐ বাড়িওয়ালা।

ধ্রুব আশ্চর্য হয়ে বললে, না না, উনি খুব ভাল, আমাদের সঙ্গে তো রীতিমত ভাল ব্যবহার করেন !

অনাদিবাবু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানবেন সব। বাইরে খুব মিষ্টি মিষ্টি ব্যবহার, কথাবার্তা···'

কথা শেষ না করেই ঝট করে ছাতাটা খুলে মাথায় দিয়ে হনহন করে চলে গেলেন।

অনাদিবাবু লোকটিকেই খারাপ মনে হয়েছিল ধ্রুবর। হয়তো কোন কারণে রাখালবাবুকে পছন্দ করেন না। কিংবা স্রেফ ঈর্ষা। রাখালবাবুর এই বিশাল তিনতলা বাড়ি, দোতলায় আর গ্রাউণ্ড ফ্লোরে চারখানা ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়েছেন, দু'খানা গাড়ি, বিরাট ব্যবসা। ঈর্ষা হবারই তো কথা।

কিন্তু তার জন্যই কি যেচে আলাপ করে তাঁর সম্পর্কে সাবধান করলেন অনাদিবাবু ? নাকি ভালমানুষ বা খারাপ মানুষ বলে কেউ নেই। প্রত্যেকটি মানুষ তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক দিয়ে বিচার করে। যে একজনের কাছে ভাল, অন্যজনের কাছে সেই খারাপ।

অবিনাশকে ধ্রুব পছন্দ করে, এত আপন মনে হয়, ধ্রুবর তো ধারণা ও খুবই ভালমানুষ, অথচ অফিসের অনেকেই অবিনাশকে পছন্দ করে না। টীকাটিপ্পনিও করে।

কিন্তু রাখালবাবু যে এভাবে ওকে অবাক করে দেবেন ধ্রুব ভাবতেও পারেনি।

বাড়ি ফিরেই দেখলে একেবারে শোবার ঘরে প্রীতি মেয়েদের সভা বসিয়েছে। হো হো হাসির শব্দ আগেই শুনতে পেয়েছিল। যেন অনেকগুলি মেয়ে একসঙ্গে কথা বলছে। আর এলোপাথারি একটা হাসির ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

দরজা থেকে উঁকি দিয়ে দেখলো। আভাসে বুঝতে পারলো তিন তিনটি ফ্ল্যাটের মেয়েরা। কিন্তু এত হাসি হল্লা কেন বুঝতে পারেনি।

বসার ঘরের জন্যে এখনও কিছু কেনা হয়ে ওঠেনি। তাই সকলেই শোবার ঘরে। নতুন সংসার পাততে গেলে যে একসঙ্গে এত জিনিস কিনতে হয়, ধ্রুবর ধারণাই ছিল না।

শুধু পাখা আর বাল্‌ব কিনতে গিয়েই হেসে বলেছিল, ফতুর হয়ে গেলাম।

প্রীতি হেসে বলেছিল, এর মধ্যেই? এখনও তো সবই বাকি।

তারপর চোখ বুজে গলার স্বরটা কিম্ভূত করে মৃদু মৃদু হেসে বলেছিল, একসঙ্গে আড্ডা দেব, একসঙ্গে ঘুরবো, একসঙ্গে বাড়ি ফিরবো…একই বাড়িতে…

ধ্রুব ওর ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেলেছিল।

প্রীতি ধ্রুবর কথাগুলোই আউড়ে যাচ্ছিল। বিয়ের আগের কথাগুলো।

তখন ওরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল, প্রীতি ঝট্ করে উঠে পড়ে বলেছিল, সর্বনাশ, ন'টা বেজে গেছে। পৌঁছতে পৌঁছতে…

ধ্রুব তখনই বলেছিল প্রীতিকে।—দু'জনে একসঙ্গে আড্ডা দেব, একসঙ্গে ঘুরবো, একসঙ্গে বাড়ি ফিরবো, একই বাড়িতে, এমন হ'লে, কি ভাল যে হ'ত।

শুনে প্রীতি বুঝতে পারেনি, বিস্ময়ের গলায় বলেছিল, যাঃ, তা কি করে সম্ভব?

ধ্রুব হেসে বলেছিল, কেন, বিয়ে করে।

মুহূর্তের জন্যে লজ্জা পেয়েছিল প্রীতি। মাথা নীচু করেছিল, সারা পথ ধ্রুবর মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। কিংবা ধীর পায়ে ধ্রুবর পাশে পাশে হেঁটে বাসস্টপ অবধি আসার সময় ওর বুকের মধ্যে কিছু গুনগুন করে উঠেছিল।

পাশের ঘরে একা বসে ছিল ধ্রুব। ও এসেছে দেখেই বোধহয় মেয়েদের হাসিহল্লা থেমে গেল। একে একে সকলে চলে গেল।

আর প্রীতি হাসতে হাসতে এসে বললে, আজ যা একটা খবর দেব-না, দাঁড়াও…

ব'লে ওষুধের তাক থেকে স্মেলিং সল্টটা নিয়ে এসে বললে, নাও, হাতে রাখো, কি জানি যদি ফেন্ট হয়ে যাও খবর শুনে....

ধ্রুব সপ্রশ্ন চোখে তাকালো।

প্রীতি বললে, তোমার ঐ রাখালবাবু, তুমি বলছিলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন স্ত্রীর কথা বলতে বলতে...

ধ্রুব বললে, কি হয়েছে ?

প্রীতি হেসে লুটোপুটি।—দ্বিতীয় পক্ষকে আজ নিয়ে এলেন, নতুন বৌকে দেখলাম আজ...

ধ্রুব বিশ্বাস করতে পারছিল না।

প্রীতি বললে, আমি একা নই, সব ফ্ল্যাটের সবাই দেখেছে।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, দু'মাস আগেই নাকি রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিল। কি অসুবিধে ছিল বলে এতকাল আনতে পারেনি।

তারপরই সেই ব্রহ্মাস্ত্র।—অবাক হবার তো কিছু নেই। তোমরা ছেলেরা স্যার, সবাই এক।

ধ্রুব কোন উত্তর দিল না, প্রতিবাদ করলো না। শুধু মনে হ'ল, সত্যিই অবাক হবার কিছু নেই। প্রত্যেকটি মানুষই এই রকম কিনা কে জানে। তার একটা দিক যখন বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে, হয়তো অন্যদিকটা তখন আরেকজনকে আঁকড়ে ধরতে চায়। সেটাই স্বাভাবিক। নাকি, কান্নাটা রাখালবাবুর অভিনয় ?

৪

কয়েকটা বছরের মধ্যে প্রীতি ফ্ল্যাট গুছিয়ে নিয়েছে সুন্দর করে। প্রথম প্রথম ঘরগুলো বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগতো। একটাই লাভ ছিল, টিপু নড়বড়ে পায়ে সারা বাড়ি ছুটে বেড়াতে পারতো। এখন আর ওর পা নড়বড়ে নেই, দিব্যি হাঁটতে পারে, দৌড়তে পারে। কিন্তু দৌড়ে বেড়ানোর জায়গা নেই আর।

বসার ঘরে চমৎকার শোফাকৌচ বানিয়ে নিয়েছে।

ওসব ধ্রুবর একটুও পছন্দ ছিল না। ওর ইচ্ছে ছিল বেশ হেলান দিয়ে বসা যায় এমন একসেট বেতে বোনা চেয়ার। তার দামও বেশ কম, বসেও আরাম। কিন্তু প্রীতি রাজি হ'ল না।

কোত্থেকে একটা আমেরিকান ফ্যাশন ম্যাগাজিন নিয়ে এলো, বোধহয় নীচের তলার বঙ্কিমবাবুদের কাছ থেকে। পাতা উল্টে উল্টে এমন একটা ডিজাইন পছন্দ করলো, যা কারও বাড়িতে দেখা যায়নি। যেন অন্য কারো বাড়িতে দেখা গেলেই সেটাকে যথেষ্ট ভাল বলা যাবে না।

বসার ঘরে একটা ডিভান এলো। এক কোণে টি ভি।

ধ্রুব আপত্তি করে বলেছিল, কেই বা আসছে আমাদের এখানে, এত শোফাকৌচ ডিভান কি হবে!

প্রীতি বললে, বাঃ রে, কেউ আসবে বলেই কি বসার ঘর ? কেউ যদি আসে হঠাৎ, ঐ তো পাশের ফ্ল্যাটের ওরা একদিন এলো, খাটে বসতে দিতে হ'ল।

হেসে বললে, ধরো দাদাই যদি একদিন এসে থাকতে চায়। শোবে কোথায়। আমি ডিভানের অর্ডার দিয়ে এসেছি, বক্স মত হবে। ভিতরে লেপতোষক তুলে রাখা যাবে, ওপরে গদি। কেউ এলে শুতেও পারবে।

তারপরই এই ডিভান। আর একটা আলমারিও এলো। কাপড় রাখার

নাকি জয়াগা নেই। শেষে ফ্রীজ।

ফ্ল্যাটটা ক্রমশ সাজিয়ে তুলছে প্রীতি, আর তা দেখে ধ্রুবর ভালই লাগতো। কিন্তু ধ্রুবর আরেক চেষ্টা ছিল টাকা জমানোর। সেটা আর সম্ভব হচ্ছিল না বলেই ভিতরে ভিতরে রাগ।

আসলে ধ্রুব একটা স্বপ্ন দেখতো। কোথাও এক টুকরো জমি কিনে বাড়ি করবে। অন্তত একটা ফ্ল্যাট কিনবে। আজকাল তো লোন পাওয়া যায়, সব টাকা দিতে হয় না। মাসে মাসে ভাড়ার মতই কিস্তিতে লোন শোধ করা যায়। আছে তো সেই বাবার দেওয়া হাজার পঞ্চাশ টাকা। না, সুদে বেড়ে এখন বোধহয় ষাট। কিন্তু আরও অনেক লাগবে।

প্রীতিকে খরচ কমানোর জন্যে সে-কথা বলতেই ও বলে উঠেছিল, অত টাকা জমাবে তুমি ? টিপু বড় হচ্ছে না ? স্কুলে দিতে হবে না ?

অর্থাৎ খরচ বাড়বে বই কমবে না।

অথচ এখন ধ্রুবর বড় অনুশোচনা হয়। প্রথম থেকেই যদি চেষ্টা করে টাকা জমিয়ে ফেলতো, তা হ'লে লোনটোন নিয়ে হয়তো হরিশ মুখার্জি রোডে ওদের বাড়ির সামনে যে চারতলা ফ্ল্যাট বাড়িটা উঠলো, তার একখানা ছোট ফ্ল্যাট কিনে ফেলতে পারতো। তখন কত সস্তায় পাওয়া যেত। এখন শুনছে দিনে দিনে নাকি দাম বাড়ছে।

প্রীতিকে সে-কথা বলতেই ঈষৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, ভাগ্যিস কিনে ফেলনি। ও বাড়ির সামনেই ? দরকার নেই আমার ফ্ল্যাটের।

আসলে স্মৃতির গায়ে জড়ানো তিক্ততাটুকু ও কিছুতেই যেন ভুলতে পারছে না।

তিক্ততা একসময় ধ্রুবর মনেও ছিল। কিন্তু এতদিন বাদে, এখন তো ও রীতিমত সুখী,তেমন কোন অশান্তি নেই, তাই তিক্ততাটুকুও ধুয়ে মুছে গেছে। হাল্কা হয়ে গেছে চাপা অপরাধবোধ।

প্রথম প্রথম ও অফিস থেকে ফেরার সময় বাবা-মার সঙ্গে দেখা করে আসতো। একদিন তো ভুলে ও বাড়িতে চলে গিয়েছিল। যেন বাড়ি ফিরছে। দরজার সামনে পৌঁছে ভুল ভাঙলো। নিজের মনেই হেসে ফেলেছিল সেদিন। এতদিনের অভ্যাস, ভুল সেজন্যেই। যেন ওদের সঙ্গেই দেখা করতে গেছে এমন স্বাভাবিক মুখ করেই ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু এতদিনের সেই ভুলটা নিজের মধ্যেই গোপন হয়ে আছে। ওদের

তো বলেই নি, প্রীতিকেও না। শুনলেই কিছু একটা বলে বসতো।

আজকাল মাঝেসাঝে যায়। সময়ের ব্যবধান ক্রমশই বাড়ছে। বাস থেকে ওখানে নামলে বকুলবাগানে আসা রীতিমত কষ্টকর। সরাসরি বাস নেই হয় ট্যাক্সি, কিংবা হেঁটে আসা। আজকাল বড় ক্লান্ত লাগে।

ওখানে গেলে মা এটাওটা খাওয়াতে চায়, বাবা টিপুর কথা, প্রীতির কথা জিগ্যেস করে। ধ্রুবর বড় অস্বস্তি লাগে।

কেবলই মনে হয় কি স্বার্থপর আমি। অথচ স্বার্থপর না হ'লে বাঁচাও যায় না। যেন সুখ শান্তি সব স্বার্থের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে।

বড়বৌদি মেজবৌদি খুব অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলে, যেতে না যেতে চা করে নিয়ে আসে, প্লেটে করে খাবার।—আহা, তুমি তো আপিস থেকে আসছো।

মেজবৌদি একদিন হেসে বলেছিল, বাড়ি থেকে যদি আসতে, দিতাম নাকি ? স্রেফ এক কাপ চা। খাওয়াতে হয় সে মুখপুড়ি খাইয়ে পাঠাবে, আমি কেন দেব।

কথাগুলো খুব আপন আপন মনে হ'ত।

মেজবৌদিও মাঝেমাঝে ধ্রুবদের কাছে বেড়াতে আসে। সিমলিকে সঙ্গে নিয়ে। সিমলি কেমন চড়চড় করে বড় হয়ে গেল।

কলিং বেল বাজাতেই ধ্রুব ভেবেছিল মেজবৌদি এসেছে। রবিবারের দুপুরে, এ সময়ে আর কেই বা আসতে পারে। প্রীতিদের বাড়ি থেকে কেউ এলে সন্ধ্যের দিকে আসে।

প্রীতি দরজা খুলতে গেল। খুলেই, 'ও মা আপনি ? কি ভাগ্যি।'

কথা শুনেই বিছানা ছেড়ে ধ্রুবও এগিয়ে গেল।

তারপরই বলে উঠল, ছোটমাসী, তুমি। এতকাল পরে হঠাৎ ? পিছনে ছোট মেসো, হেসে বললে, পর্বত তো মহম্মদের কাছে যাবে না।

আসলে ছোটমাসীকে দেখে অবাক হবার কথা নয়। আগেও একবার এসেছে। অবাক করেছে ছোটমেসো। এই প্রথম।

ওদের বসার ঘরে বসিয়ে প্রীতি বাচ্চা চাকরটাকে ফিসফিস করে কি বললে, টাকা দিল।

মিষ্টি আনতে পাঠালো।

ছোটমাসী বোধহয় বসার ঘরে বসেই টের পেল। চিৎকার করে বললে,

এই ধ্রুব, বৌকে বারণ কর, কিছু যেন না আনায়। আমরা এইমাত্র খেয়ে এলাম।

কিন্তু প্রীতি সে-কথায় কান দিল না।

অনেক হাসাহাসি-গল্পগুজবের পর ছোটমেসো ঘুরে ঘুরে ঘর ক'খানা দেখলো, রান্নাঘরে উঁকি দিল, একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। রোদ্দুরের জন্যে চলে এলো।

বারান্দায় রেলিং ধরে একটা লতানে মানি প্ল্যান্ট অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছে প্রীতি, কয়েকটা ঝোলানো টবে ফুলের গাছ।

ছোটমেসো হেসে বললে, বাড়িতে মানিপ্ল্যান্ট রাখলে নাকি খুব টাকা হয়? কি বৌমা, সত্যি?

প্রীতি হেসে উঠলো।—প্রচুর। রাখার জায়গা পাচ্ছি না।

ছোটমেসো বললে, নাঃ, চমৎকার ফ্ল্যাট, চমৎকার।

আর তখনই ছোটমাসী বললে, নিজে তো দিব্যি এমন একটা ফ্ল্যাট বাগিয়ে নিয়েছিস ধ্রুব, আমাদের একটা জোগাড় করে দে না।

এই ব্যাপার! সেজন্যেই আসা।

প্রীতি বললে, কেন মাসীমা, আপনাদের ও বাড়ি কি হ'ল?

ছোটমাসী দুঃখী দুঃখী মুখ করে বললে, সে আর বলিস না। তোর ছোটমেসো বলছে উকিল ওকে ডুবিয়েছে, উকিল বলছে তোর ছোটমেসো ডুবিয়েছে। মামলা তো হেরে গেছি, মাত্র এক বছর সময় দিয়েছিল···

—সে কি! আজকাল আবার মামলায় হারে নাকি কেউ? ধ্রুব অবিশ্বাসের সুরে বললে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ছোটমাসী ধ্রুবর হাত দু'খানা ধরে বললে, দ্যাখ না বাবা তুই, আমরা তো খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে গেলাম।

ছোটমেসো জিগ্যেস করলো, তোমাদের ফ্ল্যাটের কত ভাড়া ধ্রুব?

—সাড়ে চারশো। আগে চারশো ছিল, পঞ্চাশ টাকা বাড়াতে হয়েছে।

ছোটমেসো বলে উঠলো, মাত্র?

তারপরই বললে, খুব সময়মত পেয়ে গিয়েছিলে। এখন আটশো হাজারেও পাবে না, তার ওপর দশ বিশ হাজার অ্যাডভান্স। তাও তো পাচ্ছি না।

এবার ধ্রুবরই অবাক হবার পালা। বাড়িভাড়ার কোন খবরই রাখতো না

ও। জানার প্রয়োজনও হয়নি।

এই ফ্ল্যাটের ভাড়া এখন আটশো কিংবা হাজার! শুনে ভালই লাগলো।

ভিতরে ভিতরে বেশ একটা গর্ব অনুভব করলো।

যাবার সময়েও ছোটমাসী মনে পড়িয়ে দিলো।—একটু খোঁজ রাখিস বাবা, কোথায় যে গিয়ে উঠবো কোন কূলকিনারা পাচ্ছি না।

ছোটমেসোকেও খুব উদ্ভ্রান্ত লাগলো।

ওরা চলে যেতেই প্রীতি বললে, দেখলে তো? যে আসে সেই বলে চমৎকার ফ্ল্যাট, তোমারই কেবল দক্ষিণ দক্ষিণ। তখন না নিলে কি হত বুঝতে পারছো!

ধ্রুব কোন উত্তর দিল না। এই ফ্ল্যাটটা নিজের মনোমত হয়নি, মন্দের ভাল, কিন্তু অন্য অনেকে চমৎকার চমৎকার বলে বলেই পছন্দ করিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া এর চেয়ে ভাল আর কোথায় বা পেত।

কিন্তু ছোটমেসোর চিন্তিত উদ্ভ্রান্ত মুখ দেখে ওর মনও খারাপ হয়ে গেল। বেচারি। এই বয়সে নিরাশ্রয় হওয়ার ভয় যে কি দুঃসহ, ধ্রুব বুঝতে পারে। বাবাকেও তো দেখেছে, যখনই বাড়িওয়ালা এসে মিষ্টি মিষ্টি হেসে উঠে যাওয়ার কথা বলতো, বেশ কয়েকদিন ধরে বাবার মুখে ভয়ের ছাপ দেখতে পেত। ছোটমেসো তো আবার মামলায় হেরে বসে আছে। এক বছর সময় পেয়েছে, এই যথেষ্ট। কিন্তু যত দেরি হবে, ততই তো ভাড়া বাড়বে।

ইনফ্লেশন কথাটা মাঝে মাঝেই শোনা যায়। তর্কবিতর্ক উঠলে ধ্রুবও উচ্চারণ করে। কিন্তু কাউকে যেন স্পর্শ করে না, নাড়া দেয় না। যেন স্বাভাবিক কোন ব্যাপার। অবয়বহীন, ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অনুভূতির বাইরে কোন অশরীরী দৈত্য যেন।

আজকাল বাড়ি ভাড়া এত বেড়ে গেছে ওর ধারণাই ছিল না। এই সেদিনও তো রাখালবাবুদের ওপর রেগে গিয়ে প্রীতিকে বলেছিল, এভাবে থাকা যায় না, অন্য ফ্ল্যাট দেখতে হবে।

ভেবেছিল, আরো বেশি ভাড়া দিলে আরো ভাল ফ্ল্যাট পাওয়া যাবে।

ধ্রুবর অবশ্য ইতিমধ্যে অফিসে দু'দুটো লিফ্‌ট্‌ হয়েছে। মাইনে বেড়েছে। কিন্তু খরচখরচাও বেড়েছে। তবু মনে হয়েছে আরো বেশি

ভাড়া দিতে পারবে।

দিতে পারবে বলে ভিতরে ভিতরে একটু অহঙ্কারও ছিল।

প্রীতিকে বলেছিল, তোমার দাদার কথা মনে আছে ? বলেছিল, সাড়ে চারশো টাকা বাড়িভাড়া দিলে খাবে কি !

ব'লে হাসলো। হাসির মধ্যে যেন একটা অহঙ্কার। অর্থাৎ দিতে তো পারছি। দিয়েও অভাবের মধ্যে তো সংসার চালাতে হচ্ছে না।

প্রীতি বললো, দাদা সেভাবে বলেনি। সত্যি তো, যেভাবে বাড়িভাড়া বাড়ছে, লোকগুলো যাবে কোথায় ?

তারপরই বললে, আর এখন যাদের নতুন করে ফ্ল্যাট দরকার, তাদের কথা ভাবো তো।

এ-সব ভাবনাচিন্তার বাইরে। কেউ কিছু ভাবে না। যে যার নিজের কথা ভাবে। নিজের সমস্যার নিজেকেই সমাধান করতে হয়।

ধ্রুব ভেবে রেখেছে যেমন করে হোক্ একটা ফ্ল্যাট কিনবে ; টাকা জমানোব চেষ্টাও করছে। কিন্তু তার দামও তো বাড়ছে চড়চড় করে। নাগাল পাবে কিনা কে জানে।

রাখালবাবুর সঙ্গে সম্পর্কটা এখন আর তেমন নেই। অথচ প্রথম প্রথম কত অন্তরঙ্গতা। ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও দু'একবার এসেছেন।

ধ্রুবর, প্রীতির ভালই লেগেছিল।

তারপরই একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

রাখালবাবু একদিন রাস্তায় ধরলেন ধ্রুবকে। মর্নিং ওয়াক করে ফিরছিলেন, ধ্রুব ফিরছে বাজার থেকে।

রাখালবাবু চারপাশ দেখে নিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বললেন, একটা কথা ভাবছিলাম।

ধ্রুব সপ্রশ্ন চোখে তাকালো ওঁর দিকে।

রাখালবাবু একমুখ হেসে বললেন, তোমরা তো সওয়া দু'জন লোক, তিন তিনখানা ঘর নিয়েছো। অনেক জায়গা।

ধ্রুবর বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠলো। একটা ঘর ছেড়ে দিতে বলবে নাকি ? নাকি আবার কোন অজুহাত দেখিয়ে আবার ভাড়াবাড়াতে বলবে।

ভয় পাওয়া মুখে ও শুধু তাকিয়ে রইলো।

রাখালবাবু ট্রাউজার্সের দু'পকেটে দু'খানা হাত ঢুকিয়ে একেবারে

আধুনিক ছোকরা হবার ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন পা ফাঁক করে। ওঁকে অবশ্য এ-সব একেবারেই মানায় না, তার ওপর পায়ের ঘের বড় বেশি ঢিলেঢালা। মানুষটার মতই।

বললেন, তোমাদের অসুবিধে কিছু হবে না। মানে···

ধ্রুব অধৈর্য হয়ে বললে, বলুন না, কি বলতে চান।

রাখালবাবু বললেন, আমার একটা লোহার সিন্ধুক আছে, তোমাদের ঘরে রাখতাম। কখনো-সখনো হয়তো এসে খুলবো, কাগজপত্র রাখবো···

ধ্রুব প্রায় বলে ফেলেছিল, তাতে আর আপত্তি কি!

আসলে উনি যে একখানা ঘর ছিনিয়ে নিতে চাইছেন না, সেটুকু জেনেই ও খুশি হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, প্রীতিকে একবার জিগ্যেস করে দেখি।

—সিন্ধুক রাখবে আমার ঘরে? প্রীতি শুনেই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

রেগে গিয়ে বললে, সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিতে পারলে না যে ও-সব চলবে না।

ধ্রুব ওর রাগ দেখে হেসে ফেললো। বললে, বলবো বলবো, এত তাড়া কিসের।

প্রীতি বললে, বুঝতে পারছো না, ব্ল্যাকের টাকা রাখবে, আর নয়তো কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা। সার্চ হলে তো ওর বাড়ি সার্চ হবে। কিছুই পাবে না।

ধ্রুব বললে, আর আমাদের বাড়ি সার্চ করে যদি পায় আমরা ধরা পড়বো। ওর জিনিস প্রমাণ করতেই পারবো না।

বলে দু'জনেই হেসে উঠলো।

পরের দিনই রাখালবাবুকে জানিয়ে দিল ধ্রুব। জানিয়ে দিয়ে তবে স্বস্তি। যেন দেরী হলে জোর-জবরদস্তি সিন্ধুকটা ঢুকিয়ে দিতেন উনি।

বললে, প্রীতি রাজি হচ্ছে না। আপনি ব্যাঙ্কের লকারে রাখছেন না কেন? ওখানে রাখুন। উল্টে উপদেশ দিয়ে দিল ও, যেন সে-কথা রাখালবাবু জানেন না।

মনোমালিন্যের সূত্রপাত তখন থেকেই। বেশ বোঝা গেল, রাখালবাবু রেগে গেছেন। কিন্তু মুখে হাসিটা লেগেই রইলো।

সপ্তাহখানেক বাদেই একটা ঘটনা ঘটলো।

ধ্রুবর নিজের টেলিফোন নেই। প্রয়োজনও হয় না। রাখালবাবু অবশ্য প্রথম দিকে, যখন খুব সদ্ভাব, বলেছিলেন, দরকার হ'লে আমার ওখান থেকেই ক'রো।

ধ্রুব কখনও করেনি। প্রয়োজনই হয়নি। আর রাখালবাবুর টেলিফোনের নম্বরটাও জেনে রাখেনি।

ধ্রুব অফিসেই দাদার ফোন পেল।—বাবার খুব শরীর খারাপ, একবার আসিস।

ধ্রুব তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লো।

হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে ইদানীং ওর যাওয়া হয়ে ওঠে না। পনেরো বিশ দিন পরপর যায়। রবিবার তো একটাই ছুটির দিন, কখনো সিনেমা থিয়েটর, কখনো টি ভি-তে ভাল ছবি থাকে। বন্ধুবান্ধবের বাড়ি, নেমন্তন্ন। সময়ই পায় না।

তাই বাবার শরীর খারাপ শুনেই ধ্রুব বিচলিত বোধ করলো। কেমন একটা অন্যায়বোধ। দু'সপ্তাহ কোন খবরই রাখেনি। তেমন গুরুতর কিছু নয় তো?

ভাবলো, প্রীতি আর টিপুকে নিয়ে যাওয়া উচিত।

এসেই প্রীতিকে বললে, শিগগির তৈরি হয়ে নাও, বাবার খুব অসুখ। দাদা ফোন করেছিল।

ওদের নিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে এসে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

বাড়ির সামনে পৌঁছেই দেখলো ডাক্তারের গাড়ি। কাচের ওপর লাল ক্রশ।

দ্রুত ওপরে উঠে গেল ও। সিমলিকে দেখতে পেয়েই জিগ্যেস করলো, কেমন আছেন রে!

সিমলি দৌড়ে এসে টিপুকে কোলে নিল। প্রীতিকে বললে, কতদিন পরে এলে কাকিমা! তোমাদের একটু আসতেও ইচ্ছে হয় না।

আধখানা সিঁড়ি উঠতেই ধ্রুব দেখতে পেল ডাক্তারবাবু নামছেন।

ও সরে দাঁড়ালো। দু চারটে কথা শুনলো। উনি বেরিয়ে গেলেন।

সিমলি এতক্ষণে ওর কথার জবাবে বললে, দুপুরে তো বড় ডাক্তার এসেছিল। কাল যে কি অবস্থা গেছে ভাবতে পারবে না।

ওপরে উঠে এসে বাবার খাটের পাশে দাঁড়ালো। কেমন একটা ঘোরের

মধ্যে শুয়ে আছেন।

দাদা ডাক্তারবাবুকে বিদায় দিয়ে ফিরে এসে বললে, সকালে এত ছুটোছুটি গেছে, তোকে খবর দিতে পারিনি।

তারপর বললে, কিডনির রোগ। দুপুরে ডাক্তার দাঁ এসেছিলেন, বললেন, ভয়ের কিছু নেই। এখন ভালোর দিকে। দিন সাতেক আগে থেকেই, আমরা ভেবেছিলাম ঠাণ্ডা লেগে জ্বর···

ধ্রুবকে যে আরো আগে খবর দেওয়া হয়নি সেজন্যেই যেন দাদার এত সঙ্কোচ।

ধ্রুবর নিজেরও খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, ওকেই সব শেষে খবর দেওয়া হয়েছে। বাড়ি ভর্তি লোকজন। মামা মাসিমাও এসে গেছেন। পিসিমাকেও দেখেছে। ওদের আগে খবর না দিলে এসে পড়লো কি করে। ওরা অবশ্য, ধ্রুব আগে যে ঘরে থাকতো, সেই ঘরে বসে গল্প করছে। যেন গল্প করতেই আসা। দু' বৌদি ওদের চা বানানো, খাবার দাবার নিয়ে ব্যস্ত। বাড়িতে একটা গুরুতব অসুখ না হলে আত্মীয়স্বজনের আড্ডা জমে না। যাদের সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয়, এই সুযোগে তাদের রীতিমত একটা রি-ইউনিয়ন।

ধ্রুব ভেবে এসেছিল বাবার অসুখ বাড়াবাড়ি দেখলে রাতে এখানেই থেকে যাবে। কিন্তু এত লোকজন দেখে থাকতে ইচ্ছে হল না। শোবার জায়গাই হবে না।

মেজবৌদি বললে, রাত্রে থাকবে তো।

ধ্রুব বললে, না।

—সে কি, তোমাদের যে ভাত চড়িয়ে দিলাম। অন্তত এখানে খেয়ে যাও।

প্রীতিই জবাব দিল—কেন ওসব করতে যাচ্ছো দিদি। তাছাড়া এত লোকজন, আমরা ফিরেই যাবো।

তবু মেজবৌদি ওদের ছাড়লো না। না খেয়ে যেতে দেবে না।

তারপরও কিছুক্ষণ থাকতে হ'ল। শোবার জায়গা, বিছানাপত্তর যে পিসিমা আর মাসিমার দল দখল করে নিয়েছে বলেই চলে যেতে হচ্ছে তা কি আর ওরা বুঝবে! হয়তো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে, দ্যাখো, ছেলের কাণ্ড, বাবার এমন অসুখ, শুনেই আমরা ছুটে এলাম, আর ছেলে

তার বৌকে নিয়ে চলে গেল।

দাদা বললে, তোরা চলেই যা। এখন তো আর ভয়ের কিছু নেই।

কেন বললে কে জানে। হয়তো অসুবিধে বুঝেই। নাকি পিসিমা মাসিমার কাছে দেখাতে চাইলো বড়ছেলে কত কর্তব্যপরায়ণ, আর ছোটছেলে বাবা-মা'র তোয়াক্কাই করে না।

ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কি এমন রাত।

বকুলবাগানের এই দিকটা দিনের বেলাতেই নির্জন। সন্ধ্যের পর থেকে লোকজনের যাতায়াত কমে যায়। বড় বেশি নিঃশব্দ। আশপাশের বাড়ির আলোও তখন নিভে গেছে।

ট্যাক্সি আসতে রাজি হয়নি বলেই একটা রিক্সা ধরতে হয়েছিল।

ঠুং ঠুং করে রিক্সাটা এলোও খুব আস্তে আস্তে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর রিক্সাওয়ালা বোধহয় ক্লান্ত। তাই তাড়া দিতে ইচ্ছে হয়নি।

বাড়ির সামনে এসে নামলো। বাড়িটা একেবারে রাস্তার ওপর।

দেখলো সদর দরজা বন্ধ।

এত তাড়াতাড়ি তো দরজা বন্ধ হয় না।

দরজা থেকেই সিঁড়ি উঠেছে। নীচের তলায় দুদিকে দুই ভাড়াটে, আর সিঁড়ির পাশেই একখানা ছোট ঘর।

ঐ ঘরে সেই গোঁপওয়ালা লম্বাচওড়া চেহারার দারোয়ান থাকে। একাই। কোন কোনদিন দেহাতী বন্ধুদের জুটিয়ে এনে তাস খেলে, কি রেডিও শোনে। একটা ট্র্যানজিস্টার রেডিও সব সময় ওর বগলে ঘোরে।

ভাড়াটেরা সকলে ফিরে আসার পর রাত এগারোটা কি বারোটায় ও সদর দরজা বন্ধ করে।

ধ্রুব দরজার কড়া নাড়লো। কিন্তু কোন সাড়া পেল না।

বিরক্ত হয়ে খুব জোরে জোরে কড়া নাড়লো।

শেষে জোরে জোরে চিৎকার করে ডাকলো, রামদয়াল! এই রামদয়াল।

নীচের তলার ভাড়াটেরাও কেউ কি শুনতে পাচ্ছে না?

তিনতলার জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলো আলো নেভানো। এত তাড়াতাড়ি সব শুয়ে পড়েছে? হাতের ঘড়িটা দেখলো। কই তেমন রাত তো হয়নি।

ভিতরে ভিতরে বিব্রত বোধ করছিল। প্রীতি আর টিপুকে নিয়ে এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সেজন্যেই অস্বস্তিতে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। দড়াম দড়াম করে দরজায় দুটো লাথি কষিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমবাবুদের একটা জানালা খুলে গেল

বঙ্কিমবাবু প্রশ্ন করলেন, কে ?

—আমি-ধ্রুব। দেখুন তো, দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে।

ভিতর থেকে বঙ্কিমবাবুর হাঁকডাক শোনা গেল।

রামদয়াল দরজার তালা খুললো। রাত্রে ও দরজায় তালা দিয়ে রাখে। কপাট খুলে দিয়ে বললে, ছাদে ছিলাম।

ধ্রুব তখনও উত্তেজিত। ঘড়ি দেখিয়ে বললে, এর মধ্যে তালা দিয়েছিলে কেন ?

ও কোন উত্তর দিল না।

আর ধ্রুব সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে রাগের মাথায় বললে, শালা !

ঘরে ঢুকে প্রীতি বললে, এমন এক একটা কাণ্ড করো, দারোয়ানটা শুনতে পেল।

ধ্রুবর রাগ তখনও পড়েনি। বললে, শোনাবার জন্যেই।

প্রীতি অবাক হয়ে বললে, তুমি দারোয়ানকে শালা বললে ? ও যদি কিছু বলে বসতো ?

ধ্রুব বললে, ও বুঝতে পেরেছে যে ওকে বলিনি।

একটু থেমে বললে, তুমিই বুঝতে পারোনি। ছাদে গিয়েছিল না ছাই। সব ঐ রাখালবাবুর প্ল্যান, আমাদের যাবার সময় দেখেছিল। অপদস্থ করার জন্যেই তালা দিতে বলেছে।

প্রীতি হেসে ফেলে বললে, কি যে বলো !

ধ্রুব বললে, ঠিকই বলছি। ঐ যে সিন্ধুক রাখতে দিইনি আমাদের ঘরে, সেজন্যেই।

ধ্রুবর খুব অপমান লেগেছিল। এতদিন বুঝতে পারেনি বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটের মধ্যে কোন দাগ টানা আছে কিনা। এই একটা ঘটনায় বুঝতে পারলো। রাগের মাথায় গালাগাল দিয়ে ফেলেছে, দারোয়ান নিশ্চয় রিপোর্ট করবে, তখন আবার রাখালবাবু যদি কিছু বলতে আসেন···

সকালে উঠেই বাকি তিনটে ফ্ল্যাটের বঙ্কিমবাবু, সুধাংশুবাবু, অমিতবাবু—প্রত্যেককে গিয়ে রাতের ঘটনার কথা বললে।

—এভাবে যদি দরজায় তালা দিয়ে দেয়, এ কি মেয়েদের হোস্টেল পেয়েছে মশাই ?

সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। অবশ্য চাপা স্বরে।

বঙ্কিমবাবু বললেন, দরকার হয় আমরা সব একসঙ্গে গিয়ে বলবো। প্রোটেস্ট করা উচিত।

আর তখনই তিনতলার সিঁড়ির মাথা থেকে রাখালবাবুর হাঁক শোনা গেল, রামদয়াল ! এই রামদয়াল !

নীচের ঘর থেকে রামদয়াল সাড়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে রাখালবাবুর চটির শব্দ শোনা গেল। নীচে নামছেন।

বঙ্কিমবাবুকে দেখতে পেয়েই বললেন, আর পারছি না মশাই, ঐ রামদয়ালটাকে নিয়ে। রিনি বলছিল, কাল রাত্রে নাকি তাড়াতাড়ি দরজায় তালা দিয়ে দিয়েছিল···

রাখালবাবু রামদয়ালকে ধমক দিলেন। —সকলে ফিরেছে কিনা দেখে তবে তো তালা দিবি।

রামদয়াল কোন কথা বললো না। মাথা নীচু করে রইলো।

আবার উঠে চলে গেলেন।

প্রীতি বললে, দেখলে তো। অকারণ চটে গিয়েছিলে।

ধ্রুবর নিজেরও মনে হল, অকারণ। তবু কেমন একটা সন্দেহ রয়েই গেল। সব ব্যাপারটাই বোধহয় সাজানো।

সামান্য একটা ঘটনা। হয়তো সত্যিই গুঁপো দারোয়ানটা খেয়াল করেনি যে ধ্রুবরা তখনও ফেরেনি, গরমের জন্যে ছাদে চলে গিয়েছিল, আর দরজায় তালা দেওয়া তো ওর অভ্যাস, তাই তালা দিয়েছিল।

ধ্রুবকে সেজন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে প্রীতি আর টিপুকে নিয়ে। নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারছি না, বিশেষ করে প্রীতিকে এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। তাই ধ্রুবর নিজেকে অপমানিত লেগেছে।

অফিসে এসে পরের দিনই বললে। বাবার অসুখ নিয়েই শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দরজায় তালা দেওয়া।

অবিনাশ হাসতে হাসতে বললে, এই তো সবে শুরু। সেদিন বলছিলে

না, তোমাদের রাস্তায় একটা ফ্ল্যাট খালি হয়েছিল...

ধ্রুবর মনে পড়ে গেল। অবাক হয়ে বললে, তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?

—সম্পর্ক আছে ব্রাদার, আছে। কোল্‌কাতায় কোথাও এখন ফ্ল্যাট খালি হয় না। কারণ, আইন ভাড়াটেদের পক্ষে। তবু ফ্ল্যাট খালি হয় কেন ?

ধ্রুব বেশ কিছুদিন আগে বাজারে যাওয়ার সময় দেখেছে ওদের বাড়ির তিন চারখানা বাড়ির পরেই একটা লরিতে মালপত্র বোঝাই হচ্ছে। ফ্রীজ, আলমারি, খাট, আরো কত কি। ঠিক একদিন ধ্রুব এ বাড়িতে যেভাবে এসেছিল।

রাস্তার একজনকে জিগ্যেস করে জানলো, তিনতলার ভদ্রলোক চলে যাচ্ছেন।

কেন চলে যাচ্ছেন জিগ্যেস করার কৌতূহল হয়নি। ফ্ল্যাট খালি হচ্ছে এটাই বড় খবর। এসেই প্রীতিকে বলেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি বলেছে, একবার গিয়ে খবর নিয়ে দেখো না, কেমন ফ্ল্যাট। কত ভাড়া।

অর্থাৎ ছোটমাসিদের জন্যে। ওদের কথা ধ্রুবরও মনে পড়েছিল। মন্দ কি, একই পাড়ায় যদি আত্মীয়স্বজন কেউ থাকে সে তো ভালই।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছে পরের দিনই।

গিয়ে শুনেছে, ভাড়া হয়ে গেছে। পাশের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বলেছেন, বিশ্বাস করবেন না, এই ছোট ছোট তিনখানা ঘর, এক হাজার টাকা ভাড়া। সিন্ধি ব্যবসাদার, অ্যাডভান্স যে কত নিয়েছে কে জানে।

রাখালবাবুও সে খবর পেয়েছেন। পেয়েই ধ্রুবর নীচের ফ্ল্যাটের বঙ্কিমবাবুকে শুনিয়েছেন।

দুটো বছর ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে, কিন্তু ধ্রুবর তো মনে হয় এই সেদিন। এরই মধ্যে ফ্ল্যাটের ভাড়া যে এমন আকাশচুম্বী হয়ে উঠবে কল্পনাও করেনি।

রাখালবাবুর হয়তো সেজন্যেই অনুশোচনা। তখন এমন বাজার ছিল না, তখনও দু'চারটে ফ্ল্যাট খোঁজাখুঁজি করলে পাওয়া যেত।

অবিনাশ বললে, সিন্ধুক নয় হে, সিন্ধুক নয়। আসলে এখন তোমার

বাড়িওয়ালা পস্তাচ্ছেন, ভাবছেন কি ভুলই করে ফেলেছি।

তারপর হেসে বলেছে, স্টেপ বাই স্টেপ, দেখে নিও। এ তো সবে শুরু। কর্পোরেশনের ট্যাক্স বেড়েছে, বলবে ভাড়া বাড়াতে হবে। ইলেকট্রিকের চার্জ বেড়েছে, ভাড়া বাড়াও। তারপর মোক্ষম দাওয়াই, জলযুদ্ধ।

—মানে ? ধ্রুব বুঝতে পারেনি।

হো হো করে হেসে উঠেছে অবিনাশ। —তাও জানো না ? আমিও ভুক্তভোগী হে, এখন জলপথে যুদ্ধ চলছে।

সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলেছে, নাও একটা ধরাও। হার্টকে তাজা করে নাও।

তারপর। —স্টেপ বাই স্টেপ, মিলিয়ে নিও। ভাড়া বাড়ালেও যা, না বাড়ালেও তাই। তিনবারের জায়গায় দু'বার পাম্প চালাবে। কতক্ষণ চালায় ? আধঘণ্টা হলে বিশ মিনিট, তারপর পনেরো কি দশ। তুমি চটবে। চ্যাঁচাবে, গালাগালি দেবে। দু'দিন পাম্প চালাবে ঠিকমত, কিন্তু ছাদে বসে বাড়িওয়ালা কলকাঠি নাড়বে। ট্যাঙ্কের চাবি আছে জানো ? সেটা তিন প্যাঁচ মাত্র খোলা রাখবে। চুরচুর চুরচুর করে জল পড়বে কলের মুখ দিয়ে, বালতি ভরবে না।

সিগারেটে দুটো বড় বড় টান দিয়ে অবিনাশ পাশের টেবিলের সুনন্দকে ডাকলো। —এই যে বাড়িওয়ালা শুনে যাও।

সুনন্দ হাসলো। তারপর সামনে উঠে এসে বললে, সব শুনছি, কিন্তু আমার ভাড়াটেদের তো দেখেননি। গুণ্ডা, দাদা, সব গুণ্ডা। গালাগালির ভাষা যদি শোনেন···

অবিনাশ বললে, ওদের মত হতে পারলে তবেই ভাই টেকা যায়। আইন আদালত নিয়ে কি আর জলপথে যুদ্ধ করা যায় তোমাদের সঙ্গে।

তারপরই ধ্রুবকে প্রশ্ন করলো, ভাড়াটেরা যে এখনও টিকে আছে কেউ কেউ, এই আমার মত, কেন বলো তো ? কারা টিকিয়ে রেখেছে ?

ধ্রুব হেসে বললে, জানি না।

—ভারি ! ভারি কাকে বলে জানো ? ঐ যে বাঁকের দু'পাশে দুটো কেরোসিনের টিন বাঁধা ? রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয় ! ওরা। সব রাস্তায় দেখতে পাবে।

হাসতে হাসতে বললে, পুরমন্ত্রীমশাই মাঝে মাঝে বিবৃতি দেন দেখেছো ? জল সাপ্লাই বাড়িয়ে দিচ্ছি। জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করে, কাকে সাপ্লাই দিচ্ছো ? সে তো বাড়িওয়ালাকে। আমাদের সাপ্লাই তো ঐ ভারি, তাও কল নয়, টিউবওয়েল থেকে। সকাল থেকে দেখবে, লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঝগড়া মারামারি। কি ? না, ওবাড়ির তিনতলায় এবাড়ির দোতলায় জল সাপ্লাই দিতে হবে। রীতিমত একটা প্রফেশন তৈরি হয়ে গেছে হে, এই বাড়িওয়ালাদের কল্যাণে।

স্টেপ বাই স্টেপ। অবিনাশ বলেছিল।

ঠিক তাই। ধ্রুব একবার পঞ্চাশটা টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল, রাখালবাবু সন্তুষ্ট হবেন।

বঙ্কিমবাবু রাজি হননি। বলেছিলেন, জলে দিচ্ছেন টাকাটা।

অমিতবাবু প্রথমে খুব হম্বিতম্বি করেছিলেন। গালাগালিও। 'আইন আছে' বলে শাসিয়েছিলেন। তারপর বুঝে গেলেন আইন ঐ খাতাকলমেই।

শেষ পর্যন্ত চার চারটে ফ্ল্যাটেই 'ভারি' এসে ঢুকল। সুযোগ বুঝে তারাও রেট বাড়িয়ে দিল। এক ভার জল ষাট থেকে লাফিয়ে এক টাকা। তার আবার দুদিন আসে না, দর বাড়ায়। কোনদিন টিউবয়েলটাই খারাপ। গরমের দিনে মাথা গরম হয়ে যায়। বঙ্কিমবাবু একদিন বাড়িওয়ালার ওপর এমন রেগে গিয়েছিলেন, বাড়িওয়ালাকে হয়তো খুনই করে বসতেন।

এর ওপর আবার নতুন ঝগড়া গোঁপওয়ালা দারোয়ানের সঙ্গে। কারণ সিঁড়িতে জল পড়লে ভারিকে ধমক লাগায় সে। একদিন নাকি ঢুকতে দেবে না বলে শাসিয়েছিল।

একদিকে রাখালবাবু। অন্যদিকে চার চারজন ভাড়াটে। এক ভাড়াটের সঙ্গে অন্য বাড়ির ভাড়াটের দেখা হলেই ফিসফিস আলোচনা। —কি করা যায় বলুন তো। এক বাড়িওয়ালাকে আরেক বাড়িওয়ালা পরামর্শ দেয়। —চাবি বন্ধ করে দিন, চাবি বন্ধ করে দিন।

অবিনাশ কথাটা ভালই বলেছিল। জলপথে যুদ্ধ।

শেষে বাড়ির মধ্যেই অশান্তি।

প্রীতির মেজাজ সব সময়েই সপ্তমে। কণ্ঠস্বরও।

কোথাও শান্তি নেই। পৃথিবীটাই যেন অগোছালো। এক অশান্তি

থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আরেক অশান্তিতে ঝাঁপ দেওয়া। আলাদা ঘরসংসার করেও সুখ নেই।

ধ্রুবর এক একসময়ে মনে হয় বিয়ের আগের দিনগুলোই যেন ভাল ছিল।

দিনরাত সংসার সংসার, অফিস থেকে ফিরে ধ্রুবর হঠাৎ একদিন মনে হয়েছিল প্রীতির ওপর বড় অবিচার হচ্ছে, মাঝে মাঝে সেই পুরনো দিনে ফিরে যেতে পারলে মন্দ হয় না।

অফিস থেকে ফিরে একদিন বললে, বাইরে যাওয়া মানে তো সিনেমা আর দোকান, দোকান আর সিনেমা, চলো আজ একবার লেকে বেড়িয়ে আসি।

প্রীতি হেসে বললে, যাক তা হলে এখনও ইচ্ছে হয়!

লেকে বেড়াতে বেড়াতে ওরা একটা গাছের নীচে দিয়ে যখন চলেছে, নড়বড়ে পায়ে টিপু হাঁটছে ধ্রুবর হাত ধরে, প্রীতি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, এই, কিছু মনে পড়ে?

ধ্রুবর মনে পড়ছে না দেখে হেসে উঠলো। প্রশ্ন করলে, কি গাছ বলো তো এটা?

ধ্রুবর মনে পড়ে গেল। বললে, সোঁদাল।

—ইস্ কি আনরোমাণ্টিক, অমলতাস বলতে পারো না!

দু'জনেই হেসে উঠলো। কারণ বিয়ের আগে ঠিক এই গাছটাকে নিয়ে এই কথাগুলোই হয়েছিল।

গাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে ধ্রুব মৃদু হেসে বললে, গাছটা মনে থাকবে না? দ্য বিগিনিং।

প্রীতি হেসে বললে, এখন তো মনে হয় দি এণ্ড।

ধ্রুব হাসলো। এই গাছটার অন্ধকার মেখে যাবার সময়েই, সেই প্রথম সাহস করে ধ্রুব বলেছিল, আমি এবার একটা চুমু খাবো।

পায়ে সাপ জড়িয়ে গেছে এমনভাবে আতঙ্কে লাফিয়ে উঠেছিল প্রীতি। —এই না, ন্না, ন্না।

ততক্ষণে প্রতিরোধ দুর্বল, প্রীতি স্থির।

ধ্রুবর বাঁহাত প্রীতির কাঁধ বেষ্টন করে সাপের মতই তার কণ্ঠতট বেয়ে নেমে আসতে চাইছিল।

প্রীতি ঝট করে ধ্রুবর সরীসৃপ আঙুলগুলো মুঠোর মধ্যে ধরে জোরে মোচড় দিয়েছে।

—উঃফ্। চিৎকার করে উঠেছে ধ্রুব।

ফেরার সময়ে ধ্রুবর অভিমানে থমথম মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আগেই সব শেষ করে দিলে বিয়ের পরে আর কি থাকবে!

লেকে আবার বেড়াতে গিয়ে সেই গাছটার তলা দিয়ে যেতে যেতে প্রীতি স্বগত উক্তিতে বললে, বিয়ের আগের দিনগুলোই ভাল ছিল। একটু থেমে বললে, সব সুখ কেড়ে নিল ঐ রাখালবাবুটা। একটা ট্যাঙ্কের চাবি!

দু'জনেই হেসে উঠলো।

এমনি সময়েই হঠাৎ একটা সুখবর শুনলো অফিসে এসেই। অনেকদিন ধরে কথাবার্তা চলছিল, সুরাহা হয়ে গেছে। অফিসের কো-অপারেটিভ থেকে মোটা টাকা লোন পাওয়া যাবে বাড়ি তৈরির জন্যে। ফ্ল্যাট কেনার জন্যেও।

সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবর মনে হ'ল যেন ওর ফ্ল্যাট কেনা হয়ে গেছে। কিংবা একটা বাড়ি।

স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিল।

প্রীতিও শুনলো। স্বপ্ন দেখলো। সে কি উল্লাস।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন বঙ্কিমবাবু বিশুষ্ক মুখ নিয়ে এসে হাজির হলেন। —ধ্রুববাবু, আপনার সঙ্গে কথা ছিল।

ধ্রুব 'আসুন আসুন' বলে তাঁকে নিয়ে গেল বসার ঘরে। কপাট বন্ধ করে দিল। একটাই তো আলোচনা এখন। একটাই বিষয়। বাড়িওয়ালা। সেজন্যে যখনই নিজেদের মধ্যে কোন পরামর্শ হয়, বসার ঘরের কপাট বন্ধ করে দেয় ধ্রুব। রাখালবাবু বা তার ছেলেমেয়ে কেউ সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করার সময় না শুনতে পায়।

বঙ্কিমবাবু একখানা লম্বা খাম এগিয়ে দিলেন।

—কি ব্যাপার? ধ্রুব সন্দিগ্ধ স্বরে জিগ্যেস করলো।

বঙ্কিমবাবু বললেন, বাড়ি ছাড়ার নোটিস।

ধ্রুব চমকে উঠলো। —সে কি?

বঙ্কিমবাবু বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। —হ্যাঁ। কাল এসেছে রেজিস্ট্রি ডাকে।

ধ্রুব সাহস জোগাতে চাইলো। —ছেড়ে দাও বললেই ছেড়ে দিতে হবে, কি আব্দার। কোন গ্রাউন্ডে তুলবে শুনি!

বঙ্কিমবাবু হাসলেন। —মামলা করবে ভয় দেখাচ্ছে, মামলাকে আমি ভয় পাই না। আমাকেও তো আত্মরক্ষা করতে হবে ধ্রুববাবু, ও জানে না তখন আমার অন্য চেহারা দেখবে। তবে ঐ, মামলা মকদ্দমার ঝামেলা কে চায় বলুন। কিন্তু উপায় তো নেই।

বঙ্কিমবাবু খবরটা জানিয়ে গেলেন। বললেন, ভাড়া দিতে গিয়েছিলাম, তাও নেয়নি। না নেয়, রেণ্ট কন্ট্রোলে দেব।

বলে চলে গেলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুব কেমন বিচলিত বোধ করলো। বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে বিরোধ, ধ্রুবর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। ওর বিরুদ্ধে তো রাখালবাবু মামলা করতে যাচ্ছেন না। তবু মনে হ'ল যেন ওরই বিরুদ্ধে। বঙ্কিমবাবুও তো একজন ভাড়াটে। সব ভাড়াটের স্বার্থ তো একসঙ্গে জড়িয়ে আছে।

ওর মনে হ'ল বাইরের পরিচয়গুলো কিছুই নয়। বঙ্কিমবাবুকে ও চিনতোও না। হয়তো ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মন কষাকষিও হয়েছে কখনো-সখনো। বঙ্কিমবাবুরা সিঁড়ির প্যাসেজে বাড়িসুদ্ধ লোকের জুতো রাখতেন।

ধ্রুব বলে বলেও বন্ধ করাতে পারেনি।

শেষে একদিন রেগে গিয়েই বলেছিল, এটা কমন প্যাসেজ, এভাবে এনক্রোচ করা চলে না। আমার বাড়িতে কেউ এলে সে সামনে জুতোগুলো দেখলে কি ভাববে বলুন তো। ভাববে আমিই রেখেছি।

রাগ সামলে নিয়ে হেসে বলেছিল, জুতো দেখিয়ে অভ্যর্থনা!

সেদিন থেকেই ওটা বন্ধ হয়েছিল।

অন্যদিকে রাখালবাবুর সঙ্গে কতদিনের চেনা, পুরনো সম্পর্ক। 'কিছুই ভুলিনি, কিছুই ভুলিনি', বলে পঞ্চাশটা টাকা ফেরত দিয়েছিলেন। তখন কত ভালমানুষ।

এখন বুঝতে পারছে, বঙ্কিমবাবু অনেক আপন। কারণ ধ্রুব আর বঙ্কিমবাবু একই শ্রেণী। রাখালবাবুরা অন্য শ্রেণী। ওঁরা বাড়িওয়ালা। অর্থাৎ ওঁদের ভাড়াটে আছে। অথচ দু'চারজন ভাল বাড়িওয়ালার কথাও তো শুনেছে। আর যারা ভাড়াটাড়া দেয় না, বাড়ির মালিক, নিজেই থাকে,

কই তারা তো এত খারাপ হয় না। নাকি তারা আবার আরেক চরিত্রের! একই মানুষ এক এক পরিচয়ে এক এক চরিত্রের মানুষ হয়ে ওঠে হয়তো।

বঙ্কিমবাবু চলে যাবার পরই কি মনে হতে আলমারি খুলে ভাড়ার রসিদগুলো দেখলো ধ্রুব। কয়েক মাস আগে থেকেই খটকা লাগছিল। রেভিনিউ স্ট্যাম্পের ওপর সইটা যেন অন্য কার, আগের সইগুলোর সঙ্গে হুবহু মিল নেই।

বঙ্কিমবাবুকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে জেনেই এক পরিচিত উকিলের কাছে ছুটে গিয়েছিল ধ্রুব।

সে তো প্রথমেই উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো, তা হ'লে তো ফৌর্জারির মামলা হবে। উপদেশ দিল, সামনে সই করতে বলবেন।

যেন এতই সহজ। সামনে সই করতে বললে তো রেগে টং হয়ে যাবে। তারপর কি করবে কে জানে। টাকা দেওয়ার পর বারবার মনে পড়াতে হয় রসিদ দেবার জন্যে। তার চেয়ে বড় কথা নিজেকে মনে রাখতে হয়। যেন টাকা নিয়েই তিনি ধ্রুবকে ধন্য করছেন।

অবশ্য দেখা গেল অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে রসিদের নম্বরের কোন গরমিল নেই। উকিলবাবু বললেন, ওটাই যথেষ্ট প্রমাণ। দরকার হয় ভাড়াটেদের সাক্ষী ডাকবেন।

তারপর হাসতে হাসতে উকিলবাবু বললেন, ভাড়াটে তোলা যায় না মশাই, তোলা যায় না। ঘাবড়াচ্ছেন কেন? মৌলালিতে আমার একটা বাড়ি আছে, মাত্র দেড়শো টাকা ভাড়া দেয়, নিজে উকিল হয়েও কিছুতেই তুলতে পারলাম না। পারবো কি করে, নিজে তো থাকি না!

একটু থেমে বিষণ্ণ মুখে বললেন, অথচ তুলে দিতে পারলেই বেচে দিতাম। ভাল দামও পাওয়া যেত। স্রেফ ব্যাঙ্কে এফ ডি করে মাসে মাসে সুদ খাও। বাবা কেন যে বাড়ি করতে গিয়েছিল...

ধ্রুব কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করলো। কিন্তু জলপথে যুদ্ধ নিয়েও থাকা যায় না। নিত্যদিন জল নিয়ে অশান্তি। মাথা গরম হয়ে গিয়ে কখন যে কি করে বসবে ধ্রুবর সেও এক ভয়।

প্রীতি বললে, ওসব ছেড়ে দাও, একটা ফ্ল্যাট কেনার ব্যবস্থা করো, অন্তত মাথা গোঁজার জায়গা।

হেসে ফেলে বললে, কিচ্ছু চাই না, শুধু কল খুললেই জল চাই।



বকুলবাগানের এই এলাকাটা বেশ ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আশপাশের কয়েকটা বাড়ি একটু পুরোনো আমলের, কিন্তু বাড়ির মালিকরা কেউ দুঃস্থ নয়, দেয়ালের খসে পড়া পলেস্তাবা মাঝে মাঝে সারানো হয়। কেউ কেউ বাইরের রঙও ফিরিয়েছে, সবুজ রঙ পড়েছে দরজা জানালায়।

এখানে অনেক সুবিধে। অফিস তেমন দূর নয়, একটুখানি হাঁটতে হয় ঠিকই, কিন্তু বাস-ট্রামের অভাব নেই। দোকানপাট, বাজার এমন কিছু দূরে নয়। এমন পাড়া ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু ঘরে যদি শান্তিই না থাকে, এ-সব সুখসুবিধে নিয়ে কি লাভ।

বঙ্কিমবাবু বাড়ি ছাড়ার নোটিস পেয়ে প্রথমে বোধহয় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। উনি তো ভয় পাবেনই, ওঁর নামেই নোটিস। তাঁর সঙ্গে ধ্রুবর কোন সম্পর্ক নেই, তবু সেও ধাক্কা খেয়েছিল।

অমিতবাবু বলেছিলেন, আমার তো মনে হয় ওয়ান বাই ওয়ান সকলের নামেই আসবে। আমাদের এখন ইউনাইটেড থাকতে হবে ধ্রুববাবু। বঙ্কিমবাবুর মামলা এখন আমাদের সকলের মামলা. একজোট হয়ে লড়তে হবে।

—ঠিকই বলেছেন। ধ্রুব মন্তব্য করেছে, ব্যাটা একজনকে ওঠাতে পারলেই একে একে সকলকে ওঠাবে।

বঙ্কিমবাবু শুনে সাহস পেয়েছেন। সেটুকুই বা কম কি। বলেছেন, আমার এখন তো উপায় নেই. দেয়ালে পিঠ দিয়েও আত্মরক্ষা করতে হবে।

কিন্তু মুখে যাই বলুক, ধ্রুবর নিজেকে বড় বিভ্রান্ত লেগেছে। এ-সব মামলা মকদ্দমা নিয়ে জড়িয়ে পড়া ওর একেবারেই পছন্দ নয়। সে আরেক অশান্তি।

তাছাড়া একটা ফ্ল্যাট কেনার স্বপ্ন ও অনেকদিন থেকে দেখছে। প্রীতিও মাঝে মাঝেই তাগাদা দেয়। —সময় থাকতে থাকতে কিছু একটা করে ফেলো। এই তো অনুপমদা কেমন একটা চমৎকার ফ্ল্যাট কিনে ফেললো। তোমার চেষ্টা নেই।

শুনে এতদিন বড় অসহায় আর অক্ষম লাগতো। এখন তো অফিস থেকে লোন পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্কেও কিছু জমেছে। বাকিটা মাসে মাসে ভাড়ার মত কিস্তিতে শোধ করে দিলেই চলবে।

ধ্রুব বঙ্কিমবাবুকে বললে, ভাবছি একটা ফ্ল্যাট কিনবো, আপনিও একটু খোঁজখবর রাখুন।

শুনেই হাসলেন বঙ্কিমবাবু। —আপনার তো টাকা আছে, তাই ও লাইনে ভাবছেন। আমার নেই। কোলকাতায় ক'জন ভাড়াটের মশাই টাকা আছে, যে জল বন্ধ করলেই ফ্ল্যাট কিনে চলে যাবে। এযুগে বাঁচতে হ'লে বাড়িওয়ালা যদি ছোটলোক হয় আপনাকেও হতে হবে। তা না হ'লে বাঁচতে পারবেন না।

বঙ্কিমবাবু বেঁচে থাকাকে সত্যি সত্যি জীবনযুদ্ধ মনে করেন। মানিয়ে চলা বা হটে যাওয়ার পক্ষপাতী নন। একসিশটেন্সের সঙ্গে যে স্ট্রাগল কথাটা জড়িয়ে আছে উনি তা বিশ্বাস করেন। সেজন্যেই বলেছিলেন, পঞ্চাশটা টাকা আপনি এক কথায় বাড়িয়ে দিলেন ? কত বাড়াবেন ? তরতর করে বাড়িভাড়া বাড়ছে, হাজার দু'হাজার, পারবেন পাল্লা দিতে ? ও তো জানে তুলে দিতে পারলেই হাজার কি দেড়হাজার পাবে, আপনার পঞ্চাশে কি হবে ওর !

ধ্রুব কোন উত্তর দিতে পারেনি। ও ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে চায়। তাছাড়া ও তো স্বপ্ন দেখছে, সুন্দর একটা ফ্ল্যাট কিনবে। নিজস্ব ফ্ল্যাট হবে। বাড়িওয়ালাকে ভাড়ার টাকা দেবার সময় যে হীনমন্যতায় ভোগে, তা আর ভুগতে হবে না।

কিন্তু কিন্তু করে বলেছে, লোভ হওয়া তো স্বাভাবিক, বঙ্কিমবাবু। পাশের ঐ বাড়ির ফ্ল্যাট খালি হ'ল, একেবারে হাজার পেয়ে গেল। শুনলে কোন বাড়িওয়ালার না লোভ হয়।

—পেলেই যদি নিতে হবে, তা হ'লে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারকে গালাগাল দেন কেন ? ঘুষখোরকে গালাগাল দেন কেন ? ওরাও তো পায় বলেই

নেয়। সোজাসুজি না পেলে বাড়িওয়ালাদের মতই প্যাঁচ কষে আদায় করে।

ধ্রুব আর কোন কথা বলেনি, বরং রাখালবাবু সম্পর্কে দুটো কটূক্তি করেছে। পাছে ইউনিটি নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফ্ল্যাটের খোঁজ করেছে।

ওর মনের মধ্যে সব সময়েই একটা উদ্বেগ। ফ্ল্যাট কেনার আগেই না রাখালবাবু কিছু একটা করে বসেন। মামলাটামলা। কে তখন ছোটাছুটি করবে। অবশ্য বিশ্বস্ত ভাল উকিল ওর চেনা আছে। বাধ্য হলে তখন বঙ্কিমবাবুর মতই লড়তে হবে। কিন্তু কে ওসব ঝুটঝামেলা চায়। তার ওপর ঐ সদর দরজায় চাবি দেওয়া। একটা ডুপ্লিকেট চেয়েও পায়নি। আর গোঁপওয়ালা দারোয়ানটা দশটা বাজতে না বাজতেই চাবি দিয়ে এক একদিন ছাদে চলে যায়। কেউ বেড়াতে এলে ধ্রুবকে ঘড়ির দিকে চোখ রাখতে হয়, নিজেকেই হাসতে হাসতে বলতে হয়, আসুন এবার। কারণ হাঁকাহাঁকি করে ও ব্যাটাকে ছাদ থেকে নীচে নামাতে আধ ঘণ্টা লেগে যাবে। বড় অপমান লাগে।

সব কারসাজি, সব কারসাজি।

আর এইসব ছোটখাটো ব্যাপারের জন্যে নিজেকে বড় নিরাশ্রয় লাগে।

ছোটমাসির দুর্ভাবনা ও এখন বুঝতে পারছে।

এই সময়েই সেই দৃশ্যটা দেখলো। দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো।

হনহন করে হেঁটেই আসছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো।

এই গলিটা দিয়েই বাড়ি ফেরে ও। বকুলবাগানের দিকে যেতে হ'লে পথ সংক্ষেপ হয়।

দৃশ্যটা ওকে চুম্বকের মত টানলো। দেখলো রাস্তার অর্ধেক জুড়ে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে একটি সংসারের যাবতীয় আসবাবপত্র। কেউ যেন ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে বের করে দিয়েছে।

খাট, আলমারি, ড্রেসিংটেবল, বুককেস। ত্রিভঙ্গ হয়ে পড়ে আছে নারকেল ছোবড়ার পুরু গদি। তার চারপাশ ঘিরে বালতি, মগ, হাঁড়িকুড়ি, রাশি রাশি মশলাপাতির কৌটো। একটা পুরোনো টিন টলে পড়েছে, তা থেকে গড়িয়ে পড়ছে সরষের তেল।

বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠলো। ধ্রুবর মুখ অজানা আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে।

অস্ফুটে বলে উঠলো, ইস্।

হঠাৎ নজরে পড়লো এক কোণে একটা তোলা উনোন, কেউ জ্বলন্ত উনোনে জল ঢেলে দিয়েছে। রান্নাও শেষ করতে দেয়নি, খাওয়ার কথাই ওঠে না। এক পাশে কড়াইয়ে আধ-রান্না কোন একটা তরকারি, অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িটা কাত হয়ে পড়ে আছে, তা থেকে ভাত গড়িয়ে পড়েছে ফুটপাথে।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকানো ছেলেটি বলে উঠলো, শালা ছোটলোক, রান্না ভাতটুকুও খেতে দেয়নি।

ধ্রুবর চোখে পড়লো কিছুটা দূরে একজন ভদ্রমহিলা, সঙ্গে দুটি বাচ্চা ছেলে, একটি ফ্রক পরা মেয়ে। ভদ্রমহিলা মুখ নিচু করে আছেন। লজ্জায়, অপমানে।

ভদ্রলোক নেই। হয়তো তাড়াতাড়ি কোথাও কিছু একটা ব্যবস্থার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন।

কে একজন বললে, ইজেক্টমেণ্ট।

কথাটা শুনেই যেন শিউরে উঠলো ধ্রুব।

মনে পড়ে গেল ছোটমাসির কথা। —তোর ছোটমেসো বলছে উকিল ডুবিয়েছে, উকিল বলছে তোর ছোটমেসো ডুবিয়েছে।

ছোটমাসির গলার স্বর কাঁদো কাঁদো। একটা ফ্ল্যাট কোথাও দেখে দে না।

ঐ নিরাশ্রয় অচেনা লোকটার জন্যে বুকের ভিতরটা হা-হুতাশ করে উঠছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি নিজের জন্যে অজানা আতঙ্ক।

মনে পড়ে গেল বঙ্কিমবাবুর নামে উচ্ছেদের নোটিশ এসেছে।

কে যেন বলছিল, আইন-আদালত ওই খাতায়-কলমে।

নিরাশ্রয়, নিরাশ্রয়। এই শহরের বেশিরভাগ মানুষ নিতান্তই নিরাশ্রয়। একটা অজানা আতঙ্ক নিয়ে বাস করে। বাড়িওয়ালার মেজাজমর্জির ওপর নির্ভর করে।

আইন আছে। আইন তো অনেকরকমই আছে। আইনের বই দেখলে মনে হবে এ দেশের প্রতিটি মানুষ কত নিশ্চিন্ত, সুখী। কারও কিছু ভয় পাওয়ার নেই। শুধু অফিস কামাই করে উকিলের কাছে, কোর্টঘরে ছুটে

বেড়াতে পারলেই হ'ল। শুধু টাকার জোরে ভাল উকিল জোগাড় করো। তাতেও নিশ্চিন্ত হতে পারবে না।

ঐ অচেনা অজানা লোকটা স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায় যাবে ভেবে কোন কূলকিনারা পেল না ধ্রুব। তার সঙ্গে ঐ গোটা সংসারের আসবাবপত্র।

ধ্রুব একটা বাড়ি করার স্বপ্ন দেখছে বেশ কিছুদিন থেকে। অন্তত একটা ফ্ল্যাট। প্রচণ্ড ঘৃণার সঙ্গে ও মনে মনে উচ্চারণ করলো, আমি আশ্রয় খুঁজবো। শুধু নিজের জন্যে। হয়তো বাড়ির মালিক হবো, কিন্তু বাড়িওয়ালা হবো না। ভাড়াটের সুখ স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে শুধু কিছু টাকার লোভে নির্দয় বাড়িওয়ালা হবো না।

কিন্তু ওসব মহৎ সঙ্কল্প এখন থাক।

প্রীতি অনেককাল থেকে বলে আসছে, ও কান দেয়নি। কারণ কান দেবার মত অবস্থা ওর ছিল না।

ছোটমাসি বলেছিল, তোর পিসিদের মত তো টাকা নেই, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, ফ্ল্যাট কিনবো কোত্থেকে।

ক'জনেরই বা আছে। এখন চড়চড় করে যা ভাড়া বেড়ে গেছে। সেই ভাড়া দেবার মত সঙ্গতিই বা ক'জনের।

সেসব চিন্তা করার কারও সময় নেই। পুরমন্ত্রী বলেছেন, জলের সাপ্লাই বাড়িয়ে দেবো। সে জল কার ঘরে যাবে সে হিসেব রাখার কথা তাঁর নয়।

তাছাড়া রাস্তায় রাস্তায় ভারিরা তো খেয়ে পরে বাঁচছে। নতুন একটা প্রফেশন। আধুনিক কোলকাতায় পুরনো একটা বৃত্তি। সেই সেকালের ভিস্তিওয়ালা এখন অন্য চেহারায়।

ল্যান্সডাউন রোডের চেহারাটা কি চমৎকার বদলে যাচ্ছে। দেখে গর্ব হয়। আমাদের কোলকাতা। ঢাকুরিয়া ব্রিজের পাশে বিরাট সুপারমার্কেট হচ্ছে। দেখে তাক লেগে গেল ধ্রুবর। আঃ, কোলকাতা বড় সুন্দর দেখতে হবে।

বাসের জানালা থেকে ঢাকুরিয়ার সুপার-মার্কেট ঘেঁষে আকাশছোঁয়া বাড়িটা দেখতে দেখতে যোধপুর পার্কে পৌঁছে গেল।

ঠিকানাটা মনে নেই। কিন্তু পিসিমার গৃহপ্রবেশের দিন এসেছিল।

অনেক লোক, বহু আত্মীয়স্বজন। সবাই খুব প্রশংসা করছিল। দারুণ ফ্ল্যাট, দারুণ। পাশাপাশি দু'খানা ফ্ল্যাট জুড়ে নিয়ে সে এক এলাহি কাণ্ড। কেটারার ডেকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা। খুব ভাল খাইয়েছিলেন পিসিমা। গোটা গোটা গল্‌দা চিংড়ি আর মুর্গীর ঠ্যাং।

পিসিমা বলেছিলেন, জমি বাড়ি কি ফ্ল্যাট যদি কিনতে চাস, তোর পিসেমশাইয়ের কাছে খবর পাবি। ও তো কম খোঁজেনি।

ধ্রুব সেজন্যেই চলে গেল একদিন। খুঁজে খুঁজে পেয়ে গেল।

বিশাল ফ্ল্যাট, খুব সুন্দর করে সাজিয়ে ফেলেছেন।

ও তো বিজ্ঞাপন দেখে দেখে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। কোথাও নাগালের বাইরে। বেশির ভাগই ফ্ল্যাটের সঙ্গে ঝামেলাও কিনতে হবে।

টাকাটাই মার যাবে কিনা স্থির নেই। কিংবা টাকা দিয়ে পাঁচ সাত বছর বসে থাকো।

পিসেমশাই সব শুনে বললেন, ফ্ল্যাটে সুখ নেই ধ্রুব, তারচেয়ে জমি কিনে বাড়ি করা ভাল। কিনবে জমি ? আছে।

ধ্রুব বললে, সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। আমি একটা ছোটখাটো ফ্ল্যাট কিনবো ভাবছি। শুধু মাথা গোঁজার আশ্রয়।

পিসেমশাই বললেন, আমি তো ফ্ল্যাট বিক্রি করে দেব ভাবছি।

একটু থেমে বললেন, একটা জমি আছে, পাঁচ কাঠা। বায়না করে রেখেছিলাম অনেক আগে। এদ্দিন ঝামেলা চলছিল। কিন্তু ফ্ল্যাট কিনে টাকা আটকে গেছে, দু'কাঠা কেউ যদি নেয়…

দামটাম শুনলো প্রীতি। দু'দিন ধরে হিসেব কষা হ'ল। ব্যাঙ্কে ইউনিটে কত আছে, অফিস থেকে কত লোন পাওয়া যাবে।

জায়গাটাও একদিন দেখে আসা হ'ল। দিব্যি পছন্দ। একটু দূর, তা হোক।

একজন কারও ওপর নির্ভর করার মত আনন্দ আর নেই। পিসেমশাই চৌকোশ লোক। ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

পিসেমশাই বললেন, ভালই হল, বাইরের কাউকে দিতে হ'ল না। তুমি পাশে থাকবে সেও শান্তি।

বললেন, জমির জন্যে টাকা বায়না নিয়েই জমির মালিকটা মরে গেল, পাঁচজনের পরামর্শে বিধবা বৌটা আর বেচতেই চায় না। মামলা চলছিল,

পাবো কি পাবো না ভেবে ফ্ল্যাট কিনে ফেললাম। এখন রায় বেরিয়েছে, এক মাসের মধ্যে পুরো টাকা দিয়ে কিনে ফেলতে হবে। তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছ ধ্রুব।

কিভাবে এত টাকার ড্রাফট করাতে হয় ধ্রুব জানতো না। ছোটাছুটি করে সমস্ত টাকা একটা অ্যাকাউন্টে এনে যেদিন ড্রাফট নিয়ে দিতে যাবে, বেশ ভয়-ভয় করছিল। একটাই ভরসা, পিসেমশাই সঙ্গে ছিলেন।

কেনা হয়ে গেল। অবশ্য ভাল দিকটাই পিশেমশাই তিন কাঠা নিয়ে নিলেন। তা হোক।

তখন রাতে ভাল ঘুম হ'ত না ধ্রুবর। আনন্দে।

ওর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। একটা বাড়ি। ছোট ছোট দু'খানা ঘর, ব্যস আর কিছু চাই না।

কিনবে বলে যখন প্রায় ঠিক করে ফেলেছে, অফিসে অবিনাশকে বললো। অবিনাশ খুব উৎসাহ দিল, যেন তার নিজেরই বাড়ি হচ্ছে, এমন খুশি দেখালো ওকে।

—করে ফেল ধ্রুব, করে ফেল। ও শুরু করলে কি করে যেন হয়ে যায়।

সেদিনই চলে গিয়েছিল হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে। ভিতরে ভিতরে এমন একটা আনন্দ হচ্ছিল চেপে রাখতে পারছিল না।

বাবা সব শুনে খুশি হলেন, তবু বললেন, দেখেশুনে কিনবি।

মা আরও খুশি।

বড়বৌদি শুনে বললে, যাক্, তোমার হলেও সুখ। আমাদের তো আর হবে না, ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে, তাদের পড়ার খরচ···

মেজবৌদিও খুব খুশি। —ধ্রুবদা করে ফেলো, তোমার দাদাদের দেখিয়ে দাও, ইচ্ছে থাকলে করা যায়।

এমন যে হবে ধ্রুব ভাবতেও পারেনি। সেজন্যেই মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় ঈশ্বর আছেন। অন্তত যাদের বাড়িঘর হয়, টাকাপয়সা হয়, নানাদিকে সাফল্য, তাদের নিশ্চয়ই ঈশ্বর আছেন। না, যাদের কিছুই নেই তাদেরও সেই ঈশ্বরই ভরসা।

ধ্রুব দৈবে বিশ্বাস করতো না, কিন্তু ওরও মনে হ'ল দৈব বলে কিছু থাকলেও থাকতে পারে। তা না হলে জগন্নাথবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে কেন। জগন্নাথবাবু এসেছিলেন পিসেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে

কি একটা কাজে। উনি বড় কন্ট্রাক্টর।

ধ্রুব নিজে দেখাশোনা করে বাড়ি করবে তা তো সম্ভব নয়। এসবের ও কিই বা বোঝে।

পিসেমশাই হাসতে হাসতে বললেন, কি ধ্রুব, এখনই বাড়ি শুরু করে দেবে নাকি ?

কে জানে কেন, ধ্রুবকে ভালো লেগে গেল জগন্নাথবাবুর। বললেন, করতে হলে এখনই করে ফেলুন, এরপরে আর পারবেন না। হু হু করে দাম বাড়ছে জিনিসপত্রের।

ধ্রুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছে, বাড়ি বলবেন না, পারলে শুধু দুখানা ঘর, মাথা গোঁজার মত।

জগন্নাথবাবু বললেন, আমি একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে দেব, কম খরচে করিয়ে দেব।

হেসে বললেন, ভয় নেই, আমি মাঝে মাঝে দেখে আসবো।

জগন্নাথবাবু রীতিমত বড় কন্ট্রাক্টর, বেশির ভাগই সরকারী কাজ। পাঁচ সাতখানা মাল্টিস্টোরিড বিলডিংও বানিয়েছেন।

ধ্রুব তাই ভয় পেয়ে বললে, না না, আমি একেবারে সাদাসিধে ছোট্ট একটা বাড়ি করবো। অত টাকা কোথায় ? ধারধোর করে···

জগন্নাথবাবু একটা কার্ড বের করে দিলেন ধ্রুবকে। বললেন, কত টাকা জোগাড় করতে পারবেন হিসেব করে, একদিন চলে আসুন। বাকিটা আমার দায়িত্ব।

সত্যি সত্যি বাড়ি শুরু হয়ে গেল। শুধু জগন্নাথবাবুব পরামর্শে নানা জায়গায় একটু ছোটাছুটি করতে হল ধ্রুবকে। কিন্তু সেটুকু এখন আর বিরক্তিকর নয়। বাড়ি হবে, নিজের বাড়ি। এর চেয়ে আনন্দের ব্যাপার যেন আর কিছু নেই।

ভিত পুজো হল, ভিত খোঁড়া হ'ল, বাড়ি উঠতে শুরু করলো।

ধ্রুব প্রায়ই যায়, দেখে আসে। ও একা গেলে প্রীতি অনুযোগ করে। প্রীতিকেও তাই প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

এ যেন এক ধরনের নেশা। চোখের সামনে দেয়াল উঠছে, কংক্রিট ঢালাই হচ্ছে। বহুদিনের একটা স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।

যেদিন প্ল্যান স্যাংশন হয়ে এসেছিল, কাগজের ওপর আঁকা নকশাটায়

চোখ রেখে ও কল্পনায় যেন বাড়িটা দেখতে পেয়েছিল। এখন সেটা আরো স্পষ্ট রূপ নিচ্ছে। ইঁটের ওপর ইঁট গাঁথা হচ্ছে, আর কি অধৈর্য লাগতো ধ্রুব আর প্রীতির। মনে হত যেন বড় বেশি সময় লাগছে। যেন রাতারাতি বাড়িটা তৈরি হয়ে যাবার কথা!

ধ্রুবর ইচ্ছে ছিল একতলায় দু'খানা ঘর। আপাতত ঐটুকুই। প্রীতি অবশ্য রান্নাঘর সম্বন্ধে কি-সব ফরমাশ করেছিল। কোথায় শেল্‌ফ হবে, কোথায় গ্যাস সিলিণ্ডার থাকবে।

জগন্নাথবাবু হেসে ফেলে বলেছেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

দেখতে দেখতে ছাদ পর্যন্ত হয়ে গেল।

কিন্তু জগন্নাথবাবু থামতে চাইলেন না। বললেন, প্ল্যান তো তিনতলা অবধি স্যাংশন হয়ে আছে, এখন অন্তত দোতলা অবধি করে দিই।

ধ্রুব ভয় পেয়ে গেল। হতাশ গলায় বললে, যা কিছু ছিল, যেখানে যা লোন পাবার সবই তো পেয়ে গেছি। আর তো কোথাও কিছু পাবো না জগন্নাথবাবু। আমার ঐ একতলাই ভাল।

জগন্নাথবাবু বলে বসলেন, আপনাকে এখন টাকা দিতে হবে না। আপনি যখন যেমন পারবেন দিয়ে দেবেন। হাসলেন উনি।

পিসেমশাই একদিন বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলেন। সব শুনে বললেন, তুমি তো ভাগ্যবান হে, নিজের টাকায় দোতলাটা করে দেবেন।

প্রীতি তো শুনে অবাক।

ধ্রুবর মনে হ'ল জগন্নাথবাবুর মত মানুষ হয় না। প্রীতি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, ভগবান, ভগবান।

শুধু পিসিমা বললেন, আমাদের বাড়িটাও এই সময় করে নিলে হত। টাকাগুলো সব ফ্ল্যাট কিনে আটকে গেছে, তা না হ'লে···

তারপরই রহস্যটা ফাঁস করলেন। বললেন, এ রকম বাড়ি আরো দু'চারটে করে দিচ্ছেন উনি। দিব্যি সুযোগ ছিল।

ধ্রুব বুঝতে পারলো না। ওর কাছে ব্যাপারটা সত্যি এক রহস্য। নিজের টাকায় দোতলা করে দিচ্ছেন। কেন কে জানে।

পিসিমা হেসে বললেন, বড় কন্ট্রাক্ট পেয়েছেন গভর্নমেণ্টের। বুঝতে পারছিস না? সব সেখান থেকে এখানে পাচার করছেন। পকেটের টাকা তো নয়।

কথাটা শুনেই ধ্রুবর চোখে জগন্নাথবাবু ভগবানের আসন থেকে একেবারে নীচে পড়ে গেলেন। তা হোক্। ওর দোতলা তো উঠছে।

এতকাল এ-সব কাজ ও ঘৃণা করেছে। অন্যায় মনে হয়েছে।

একদিন বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে রাখালবাবু সম্পর্কে বলেছিল, কালো টাকায় তো মশাই বাড়ি বানিয়েছে, পাপের টাকায়, এখন বাড়িওয়ালা বনে গেছে।

এখন আর ধ্রুবর অন্যায় মনে হচ্ছে না। মনকে বোঝালো, আমি তো অন্যায় করছি না। জগন্নাথবাবু কোত্থেকে কি আনছেন আমার জানার কথা নয়। আমি টাকা দিয়েই খালাস।

দেখতে দেখতে দোতলা উঠে গেল। সামনে ছোট্ট এক টুকরো ব্যালকনি বের করে দিয়েছেন জগন্নাথবাবু।

শুধু রঙ করা বাকি। সে পরে করা যাবে। জগন্নাথবাবুই করে দেবেন বলেছেন। অর্থাৎ ওঁর সরকারী কন্ট্রাক্টের বাড়ি এখনও হয়তো শেষ হয়নি। শেষ হলে রঙ করার সময় রঙ করিয়ে দেবেন।

কথাটা কিভাবে যেন রাখালবাবুর কানে পৌঁছে গিয়েছিল। কিভাবে আর, কাজের লোকের মারফৎ।

ইদানীং তো ওর আর প্রীতির মধ্যে আর কোন কথাই ছিল না। শুধু বাড়ি আর বাড়ি। আর কতদিন লাগবে। জানালার গ্রীল যেন সুন্দর হয়।

ঠিকে ঝি বাসন মাজতে মাজতে নিশ্চয় শুনেছে।

রাখালবাবুকে এড়িয়ে এড়িয়েই চলতো ধ্রুব। কথা বলতেও ইচ্ছে করতো না। লোকটা জল বন্ধ করে দিয়েছে, ভারির কাছ থেকে জল নিতে হয়। এদিকে পাম্প দিব্যি চলছে দু'বেলা, শুধু নিজেই নেন।

লোকটার চক্ষু লজ্জাও নেই। একবার বলতে গিয়েছিল, উত্তর এলো, এত অসুবিধে যখন, ছেড়ে দিলেই তো পারো। জল নেই, জল নেই, কর্পোরেশন দিচ্ছে না তো আমি দেব কোত্থেকে!

সারা শরীর জ্বলে উঠেছিল ধ্রুবর।

এই লোকের সঙ্গে দেখা হলে দিব্যি হেসে হেসে কথা বলতে হবে। তার চেয়ে এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।

অবিনাশ অবশ্য বলেছিল, ও তোমার রাখালবাবুকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সব বাড়িওয়ালা একই ডিজাইনের ভাই, একই প্যাটার্ন। দু'চার জন

শুধু আমাদের সুনন্দর মত।

ভারিকে দিয়ে জল আনিয়ে জলের সমস্যা মেটানো যায়। একটু খরচ বাড়ে। ধ্রুব প্রীতিকে বুঝিয়েছিল, কত আর খরচ, একশো দেড়শো। দেড়শো টাকা বেশি দিলেও এ-তল্লাটে কোথাও আর এ-রকম ফ্ল্যাট পাবে নাকি।

প্রীতিকে বোঝানো যায়, নিজেকে নয়।

এই ভারিকে দিয়ে জল আনানোয় বড় সম্মানে লাগে।

প্রথম প্রথম কি অস্বস্তি। সকালের দিকে বন্ধুবান্ধব কি আপিসের কেউ এসে পড়লে ভয়ে তটস্থ, যদি দেখে ফেলে।

উপেন থাকে চক্রবেড়িয়ায়। একদিন সকালে চলে এসেছিল কি একটা কাজে। ভারি তখন এক ভার জল নিয়ে গেছে, আবার আসবে। কাঁধে বাঁক লোকটাকে যদি দেখে ফেলে, কি আতঙ্ক। পর্দা টেনে যদিবা আড়াল করা যায়, দু'দিকের কেরোসিন টিন থেকে জল উপচে পড়বে বারান্দায়। হয়তো কিছু জিগ্যেস করে বসবে উপেন। কি লজ্জা!

এখন পুরোনো হয়ে গেছে। ওসব লজ্জাটজ্জা নেই।

বাড়িওয়ালা উঠিয়ে দিতে চাইছে। সুতরাং উঠে যাওয়াটাই নাকি ভদ্রতা।

হয়তো বলে বসবে, এত অপমান সহ্য করে থাকেন কি করে?

রাখালবাবু হয়তো দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন। মর্নিং ওয়াক করে ফিরছেন। ঢিলেঢালা প্যাণ্টে যতটা সম্ভব স্মার্ট হয়ে হাঁটছিলেন।

দেখতে পেয়েই হয়তো ফুটপাথ বদলে নিলেন, ফলে একেবারে সামনাসামনি। সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে গেল ধ্রুবর।

রাখালবাবু একমুখ হেসে বললেন, সুখবরটা জানাও নি তো এতদিন? তোমাদের নাকি বাড়ি হয়ে গেছে?

ধ্রুবকে হাসতে হ'ল। বললে, হয়ে গেছে বলবেন না, হয়ে আসছে।

—তা কবে নাগাদ উঠে যাবে ঠিক করেছো?

ধ্রুবর মন তেতো হয়ে গেল। সঠিক কোন উত্তর দিলো না। দেবেই বা কি করে। ও নিজেই তো জানে না। জলের পাইপ, বাথরুম, ইলেকট্রিক।

শুধু বললে, উঠে যেতে পারলে তো আমারও লাভ, মাসে মাসে ভাড়া গুনতে হবে না।

শুনে প্রীতি বললে, এবার বোধহয় জল দেবে। দেখছে, যখন উঠেই যাবে...

কিন্তু না। উপরন্তু মাঝেমাঝেই, সিঁড়িতে ওঠানামার সময়, ডেকে জিগ্যেস করেন। —কদ্দূর কি হল? দিন ঠিক করেছো কিছু?

সে আরেক যন্ত্রণা। দরজাটা একদিন শব্দ করে বন্ধ করে দিয়ে ধ্রুব রাগের গলায় বললে, শালা!

বাড়িটা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ধ্রুব প্রীতিকে বললে, দেখো, ছোটমাসি এলে যেন বলে বসো না বাড়ি হয়ে এসেছে। শেষে যদি নীচের তলাটা ভাড়া চেয়ে বসে...

প্রীতি বললে, ছোটমাসিরা তো বাড়ি পেয়ে গেছে, অবশ্য অনেক দূরে, ছ'শো টাকা নাকি ভাড়া।

ধ্রুব বললে, তা হোক, তবু কি জানি, যদি বলে বসে। বরং সে কথা তুললে বলে দেবে ভাড়া হয়ে গেছে।

প্রীতি সায় দিল।—ঠিক বলেছো।

তারপর একটু থেমে বললে, নীচের তলাটা কিন্তু ভাড়া দিতে হবে। তা হলে তাড়াতাড়ি জগন্নাথবাবুর ধার শোধ হয়ে যাবে।

ধ্রুব বললে, তা বলে আজেবাজে কাউকে দেওয়া যাবে না। শুধু কোম্পানি লীজ। একজন বলছিল হাজার টাকা ভাড়া হবে।

প্রীতি বলে উঠলো, বাঃ শুধু ভাড়া? অ্যাডভান্স নেবে না?

ধ্রুব মাথা নাড়লো।—দেখি।

পাওয়া যাবে না মানে? দাদা তো বলেছিল, মাড়োয়ারিকে দিলে তিরিশ চল্লিশ হাজারও পেয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

—সত্যি! খুব খুশি খুশি মুখে ধ্রুব বললে।

প্রীতি যেন একটা আশার কথা শোনালো। ঠিক বিশ্বাস হল না, তবু শুনতেও ভাল লাগলো।

এখন তো ধ্রুব একদিক থেকে নিশ্চিন্ত। আর কয়েকটা মাস, তখন আর নিজেকে নিরাশ্রয় মনে হবে না। কিন্তু ঘাড়ের ওপর এক রাশ দেনা। অবশ্য জগন্নাথবাবুর কাছে যা বাকি আছে সেটা নিয়েই চিন্তা। বাকি সবই তো মাইনে থেকে কেটে নেবে। কেটে নিচ্ছে। এরপর বাড়িভাড়াটাও দিতে হবে না। হয়তো দু'এক বছর একটু কস্টেসৃষ্টে চালাতে হবে।

একটা ইচ্ছে ছিল, বাড়ি করবে শুধু নিজে থাকার জন্যে। ভাড়া দেবে না। বাড়িওয়ালা হবে না। তাছাড়া ভাড়াটে নিয়ে তো ঢের অশান্তি। তবু পাকেচক্রে, টাকার টানাটানিতে, কিছুটা হয়তো লোভ, এখন ভাড়া দেওয়ার কথা ভাবতে হচ্ছে।

একটাই সান্ত্বনা, এখন আর নিজেকে নিরাশ্রয় মনে হয় না।

নিরাশ্রয়। কথাটা ভাবতে গিয়ে হাসি পেল। একটা বাড়িই কি মানুষের আশ্রয়? শুধু ক'খানা ঘর? হয়তো তাই। এই সমাজে, এই সমাজব্যবস্থায়। তা না হলে আজকের মানুষের সমস্ত জীবনটাই অতৃপ্ত, অসুখী কেন, শুধু একটা আশ্রয়ের খোঁজে। কেউ ভাড়ার ফ্ল্যাট খুঁজছে, কেউ তা পেয়েও উদ্বেগ কিংবা অশান্তি নিয়ে টিঁকে আছে। একদিন ভারি জল দিতে না এলেই চক্ষুস্থির, হন্যে হয়ে তাদের খুঁজে বেড়াতে হয়। আর ধ্রুবর মত যারা একটা কিছু করে ফেলেছে, তারাও তো ভাবছে সব কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। যেন জীবনে একটা ফ্ল্যাট কিংবা বাড়ি করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এই টাকায় গড়া সমাজ মানুষের জীবনের কাছ থেকে যেন আর কিছু চায় না। আর কোন চাহিদা নেই। তোমার সমস্ত কিছু বিষয়বুদ্ধির কাছে বিকিয়ে দিয়ে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, রুচি ও শিল্পবোধ, তা হলে একটা আর্ট ফিল্ম দেখে এসো, সম্ভব হলে গরিব কিংবা হরিজনদের সম্পর্কে। ছবিটা তোমার ভালই লাগবে, কারণ যারা তুলেছে, বিশ্বজোড়া নাম, তারাও ভাড়াটে। এতটুকু বিষয়বুদ্ধি নেই যে, সময় থাকতে একটা ফ্ল্যাট কিংবা বাড়ি করে ফেলবে।

ধ্রুব দৈবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। দৈব না থাকলে ওর পক্ষে এই বয়েসে কি একটা বাড়ি করে ফেলা সম্ভব হত। পিসেমশাই বে-কায়দায় পড়ে হঠাৎ দু'কাঠা জমি সেই বায়নার দরে দিতে চাইবেন কেন! তিনবছর আগেকার দাম। ভাবাই যায় না, ফ্ল্যাট কিনে ফেলে পাঁচ কাঠা জমি কেনার টাকাই ছিল না ওঁর হাতে।

তার ওপর এই জগন্নাথবাবু। দোতলাটা করে দিচ্ছি, আপনি সুবিধেমত শোধ দেবেন।

কোত্থেকে কিভাবে যেন হয়ে গেল।

কিন্তু এখন আর দৈব মনে হচ্ছে না ধ্রুবর।

—কি ভাগ্য রে তোর, এই বয়েসে একটা বাড়ি করে ফেললি। তোর

মেসো সারাজীবন চাকরি করে কিছুই করতে পারলো না।

একটু থেমে বললে, আগে রিটায়ার করে লোকে বাড়ি করার কথা ভাবতো। তাও পারতো না। তোরা আজকাল অনেক চালাকচতুর। কত কম বয়েসে সব করে ফেলছিস।

ছোটমাসি খবর পেয়েই একদিন চলে এসেছিল।

ধ্রুব হাসতে হাসতে বললে, দেনায় চুল পর্যন্ত ডুবে আছে, তোমরা শুধু ভাগ্যই দেখছো।

ছোটমাসি হাসলো, বিশ্বাসই করলো না।

তারপর বললে, নীচের তলাটা কি ভাড়া দিবি নাকি ?

ধ্রুব চটপট বললে, ও তো ভাড়া হয়ে গেছে, অ্যাডভান্সের টাকা নিয়েই বাড়ি।

ছোটমাসি হতাশ গলায় বললে, অ্যাডভান্স না হয় আমরাই দিতাম, বললি না কেন ?

ধ্রুব কোন উত্তর দিলো না। আত্মীয়কে কেউ বাড়ি ভাড়া দেয় নাকি। নিয়মিত ভাড়া না দিলে তখন কিছু বলাও যাবে না। আত্মীয় তো দূরের কথা, বাঙালীকেই দেবে না। অবাঙালীর মত অত টাকা এরা দিতে পারবে নাকি।

প্রীতি অবশ্য একদিন বললে, বাঙালী ভাড়াটে হলেই কিন্তু ভাল হত। একটা কথা বলার লোক পেতাম।

ধ্রুব বললে, কথা বলার ? না ঝগড়া করার ? সম্ভব হলে ভাড়াই দিতাম না। ভাড়াটে নিয়ে বাস করা মানেই অশান্তি।

প্রীতি সশব্দে হেসে উঠলো।—এই, তুমি বাড়িওয়ালা হয়ে গেছ এর মধ্যে। এখনো তো আমরা ও বাড়িতে উঠে যাইনি।

ধ্রুবও হেসে ফেললো। —হ্যাঁ, এখন তো আমরা বাড়িওয়ালাই।

একটু থেমে বললে, ভেবেচিন্তে করতে হবে সব। বাজারে এখন যেভাবে ভাড়া বাড়ছে, দিয়ে ফেললে তখন আর বাড়ানো যাবে না।

প্রীতি হাসতে হাসতে বললে, কেন ? সে তো আমরা শিখে নিয়েছি, জল বন্ধ করে দিলেই হবে। উঠিয়ে দিয়ে আবার বেশি ভাড়ায়···

ধ্রুব বললে, জল বন্ধ করলে সবাই কি আর উঠে যায় ? যার উপায় নেই সে কি করবে ?

তারপর হেসে বললে, তা দেখা অবশ্য আমাদের কাজ নয়। গভর্নমেণ্টই তাদের কথা ভাবে না, বাড়িওয়ালারা ভাববে কেন!

একটা কি যেন চিন্তা করলো, তারপর বললে, ভাড়া যতই বাড়ুক, তাতেও লাভ হয় না।

আগে এ-সব বুঝতো না। এখন হিসেব কষে।

—ধরো ডিবেঞ্চারে টাকা রাখলে ফিফটিন পার্সেন্ট সুদ।

প্রীতি বললে, তুমি তো দোতলায় থাকবে বলে দোতলা করেছো, নীচের তলা তো করতেই হতো। এখন সেটাকেও ইনভেস্টমেণ্ট ভাবছো কেন?

ধ্রুব ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললে, কারণ লোন শোধ করতে হবে। এর পর কর্পোরেশন ট্যাক্স আছে, এটা ওটা সারানো আছে।

একটাই সুবিধে, জলের পাম্প করতে হয়নি। রিসার্ভয়েরটা এতই কাছে, তার প্রেসারেই দোতলায় জল উঠে যায়।

জগন্নাথবাবু বলেছিলেন, পাম্পের দরকার হবে না।

একদিন গিয়ে দেখলো। সত্যি, ট্যাঙ্ক ভর্তি হয়ে উপচে পড়ছে।

জগন্নাথবাবুর ওভারসিয়ারকে বললে, ট্যাঙ্কে একটা কল লাগিয়ে দেবেন।

প্রীতি ছিল সঙ্গে। বললো, কেন?

—পরে বলবো।

পরে আড়ালে হাসতে হাসতে বললে, একটা সুবিধে কি জানো? পাম্প নেই, কতক্ষণ চালাচ্ছো তা নিয়ে ভাড়াটে ঝগড়া করতে পারবে না। যখন দরকার হবে, ধরো ভাড়াটে যদি মাথা নিচু করে থাকে, সে অন্য কথা, তা না হলে জল উঠবে একদিকে, কল খুলে আরেকদিকে বের করে দাও। বেশি চিৎকার চেঁচামিচি করলে বলা যাবে এসে দেখুন, জল ওঠেই না। সবাই তাই করে।

প্রীতি হাসলো। বললে, আমার কিন্তু আর একদিনও ও বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। চটপট সব করিয়ে নাও।

ধ্রুব নিজেও অধৈর্য হয়ে উঠছিল। শুধু সামনে এই স্বপ্নটা আছে বলেই ধৈর্য ধরেছে। একটা বাড়ি করতে যে এত সময় লাগে ও জানতোই না। জগন্নাথবাবু তো প্রথমে অনেক কম সময় বলেছিলেন, কিন্তু পারলেন না।

হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে গেলে আজকাল প্রীতির খাতির যত্ন অনেক বেশি হয়। দূরে সরে আসার জন্যে ওরা কাছের মানুষ হয়ে গেছে বলে, নাকি বাড়ি করছে বলেই ওদের দাম বেড়ে গেছে।

বড়বৌদি বললে, একদিন চলো দেখিয়ে নিয়ে এসো। একজন অন্তত ভাড়াটে নাম ঘোচালো, দেখে আসবো না?

দাদা বললে, সবই ভাল, বলছিস দু'খানা ঘর এক এক তলায়, তিনখানা না হলে···

ধ্রুব বললে, প্ল্যানে আছে, ওটা পরে বাড়িয়ে নেব।

বড়বৌদি দাদাকে ধমক দিলো। —তুমি থামো, দু'খানাও তো করেছে।

মেজবৌদি বললে, আমি বাবা রঙটঙ করার পর দেখতে যাবো। রঙ না পড়লে বাড়ি ঠিক খোলতাই হয় না।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, ধ্রুবদা, গৃহপ্রবেশে খুব খাওয়াতে হবে কিন্তু। তোমার পিসেমশাইদের মতই, গোটা গোটা গলদা চিংড়ি আর মুর্গীর ঠ্যাং।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

মেজদা বললে, হ্যাঁ, দেখিয়ে দিবি পিসেমশাইকে, আমরাও পারি। টাকা হয়েছে বলে ওঁর খুব গর্ব। কেমন বলছিলেন, পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাট জুড়ে নিয়েছি। আসলে বোধহয় বলতে চাইছিলেন, তোরা তো একটাই কিনতে পারলি না।

মেজদার কথাটা ধ্রুবর প্রথমে ভাল লাগেনি। পিসেমশাই না থাকলে বাড়িটাই তো হত না। উনি তো ও দু' কাঠা অন্য কাউকেও দিতে পারতেন। অবশ্য বাইরের লোককে বোধহয় দিতে চাননি। গায়ে গায়ে বাড়ি, আত্মীয় খুঁজেছিলেন। কিন্তু জগন্নাথবাবু? উনিও তো বিশ্বাস করেছেন পিসেমশাই মাঝখানে আছেন বলেই। একজন টাকাওয়ালা লোক, অনেকদিনের পরিচয়···

কিন্তু মেজদার কথাটা শোনার পর ধ্রুবর মনে হল, পিসেমশাই একটু টাকাও দেখাতে চেয়েছিলেন। তা না হলে ফ্ল্যাটের গৃহপ্রবেশে অত এলাহি কাণ্ড করার কি দরকার ছিল। এত লোককে নেমন্তন্নই বা কেন!

বাবা আর মার দারুণ আনন্দ। —কবে যাচ্ছিস?

মা বললেন, বাবাকে বলিস পাঁজি দেখে দিন ঠিক করে দেবে।

হাসতে হাসতে প্রীতিকে বললেন, আমি কিন্তু সত্যিনারাণ দিয়ে আসবো বৌমা।

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, হ্যাঁ, তোর মায়ের সত্যিনারাণের খুব পয়া আছে, বাড়ি হয়ে গেল।

মা বাধা দিয়ে বললেন, সে-কথা বলো না, পয়া যদি কারো থাকে সে বৌমার।

প্রীতি খুব খুশি, কুলকুল করে হেসে উঠলো। তোষামোদ করে বললে, না মা, সে আপনাদের আশীর্বাদ।

এখন এ ধরনের কথা বলতে ওর অস্বস্তি নেই। আগে পারতো না।

ধ্রুব চলে আসার আগে মা ওকে একটু আড়ালে নিয়ে গেলেন। চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁ রে, শ্বশুরের কাছে কিছু নিস নি তো ? বাড়ি করার জন্যে ?

ধ্রুব চমকে উঠলো। রেগে গেল। —কেন ? তাঁর কাছে নিতে যাবো কেন ?

—না, সে-কথাই জিগ্যেস করছি। তেমন হলে তোর বাবার শুনলে তো খারাপ লাগবে। বড় বৌমা বলছিল কিনা, অনেক টাকার ব্যাপার···

ধ্রুব রাগের গলায় বললে, ওদের বলে দিও, আমার একটা আত্মসম্মান বলে জিনিস আছে।

আবার কি একটা ঝামেলা হয় এই ভয়ে মা বললেন, না না, ওরা সেভাবে বলেনি, ধার নেয়ার কথা বলছিল···

ধ্রুব হেসে বললে, না, তাও নিইনি।

একটু থেমে বললে, ধার দেওয়ার মত অবস্থাও তাঁর নয়।

ফেরার পথে প্রীতিকে কথাটা বলতে পারলো না। চেপে গেল। শুনলে বড়বৌদি আর মেজবৌদির ওপর আবার রেগে যাবে। উল্টে হয়তো ভাববে, ধ্রুব যখন চতুর্দিকে লোনের চেষ্টা করছে, তখন হয়তো ভেবেছে, প্রীতি কেন তার বাবাকে বলছে না। একবার লোভ সত্যি হয়েছিল ধ্রুবর, কথাটা প্রীতিকে বলার। ভাগ্যিস বলেনি।

এখন জানে, উনি দিতে পারতেন না। উল্টে না দিতে পারার জন্যে লজ্জা পেতেন।

অথচ প্রীতি যদি শোনে ও মাকে বলেছে, ধার দেওয়ার মত অবস্থাও তাঁর নেই, তা হলেও রেগে যাবে। শ্বশুরবাড়িতে বাবার দুরবস্থার কথা প্রকাশ করে দেওয়ার কি দরকার ছিল। 'শ্বশুরের কাছে ধার নিতে আমার আত্মসম্মানে বাধে', এটুকু বললেই তো পারতে।

হয়তো রেগে গিয়ে বলতো, ওদের কাছে আমার বাপের বাড়িকে ছোট করে তোমার কি লাভ হল!

বাড়ি ফিরেই মেজাজটা আরো বিগড়ে গেল।

ঢোকার আর বেরোনোর সময়টা বড় অস্বস্তিতে কাটে। গোঁপওয়ালা বিহারী দারোয়ানটা আজকাল এতটুকু সমীহ করে না। আগে করতো। এমন ভাবভঙ্গি করে যেন ধ্রুব এই ফ্ল্যাটে থাকে না। ধ্রুব বেশ বুঝতে পারে এর পিছনে রাখালবাবুর উৎসাহ আছে। কিংবা কে জানে, ওঁদের কথাবার্তা শুনে লোকটা সব বুঝে নিয়েছে।

কিন্তু মেজাজ আরো বিগড়ে গেল হাত-কাটা দালালটাকে দেখে।

ধ্রুবর জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

কনুই থেকে ফুল-হাতা শার্টের হাতাটা ঝুলছে, সেই হাতটাই নেড়ে বললে, এই ফ্ল্যাটটা আমিই আপনাকে দেখে দিয়েছিলাম।

ধ্রুব রেগে গিয়ে বললে, সে আর মনে নেই? এই রকম একটা বাড়িওয়ালার কাছে জেনেশুনে…

একমুখ হাসলো লোকটা। —বাড়িওয়ালা বাড়িওয়ালার মতই তো হবে বাবু?

—তা তুমিও কি জানতে এসেছো কবে উঠে যাচ্ছি?

আবার হাসলো। —হ্যাঁ, সে-কথাই বলতে এলাম। আমাকে একটু আগে থেকে বলবেন, আবার অন্য কোন দালাল না মেরে দেয়। আগে থেকে জানলে, আমার লোক নিয়ে আসবো, কটা টাকা পেতাম, দেখছেন তো হাতটা কাটা। কিছুই করার নেই। দুটো পয়সা যদি পাই দালালি করে…

ধ্রুব বললে, ঠিক আছে, বলবো।

লোকটা তবু দাঁড়িয়ে রইলো। —আরেকটা কথা বলছিলাম। আপনার তো বাড়ি হয়ে গেছে, নীচের তলাটা নাকি ভাড়া দেবেন…

—সে কথাও জেনে গেছো?

লোকটা হাসলো। ঘাড় নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

লোকটাকে বলতে পারতো, পরে বলবো। কিংবা ভাড়া দেব না।

তবু একটু যাচিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল।

জায়গাটার মোটামুটি একটু ধারণা দিল। বললে, দু'খানা ঘর, ভিতর দিকে বারান্দা, সামনে ব্যালকনি···

—ব্যালকনি আছে? লোকটা খুব খুশি।

ধ্রুব বললে, সে তো দোতলায়।

—কিচেন খুব ছোট নয় তো?

ধ্রুব বললে, না।

লোকটা বললে, খুব ভাল পার্টি আছে, আজ রাত্রেই নিয়ে আসবো স্যার। অ্যাডভান্স দেবে মোটা টাকা। কত চান বলুন····

লোকটা যেন ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

ধ্রুব বললে, এখন নয়, এখন নয়।

কোনরকমে তাকে বিদায় দিল।

তারপর নিজেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো।

ভিতরের রঙ আগেই হয়ে গিয়েছিল, বাড়ির বাইরেটায় রঙ পড়তেই সমস্ত পাড়াটাই যেন ঝলমল করে উঠেছে। ধ্রুব যখনই বাড়ি ফেরে, অফিস থেকে, কিংবা বাজারের থলি হাতে নিয়ে, প্রাণভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। দেখে আর গর্বে, পুলকে বুক ভরে ওঠে। মনে মনে বলে আমার বাড়ি, নিজস্ব বাড়ি।

এর প্রতিটি ইঁট যেন ধ্রুবর স্বপ্ন দিয়ে গাঁথা। কৃচ্ছ্রসাধনই কি কম আছে এর পিছনে, কে তার খোঁজ রাখে। পরিশ্রম, উদ্বেগ, অর্থ, কি না দিয়েছে এই বাড়ির জন্যে।

আমার নিজের বাড়ি। বলতেও আনন্দ।

ধ্রুব, প্রীতি আর টিপু। দেখতে দেখতে টিপু কত বড় হয়ে গেছে। মাস দুই হল ওরা এই নতুন বাড়িতে উঠে এসেছে। ভাবছে, টিপুকে এবারই পাড়ার স্কুলে ভর্তি করে দেবে।

সেখানেই খবর নিতে গিয়েছিল। রিকশা করে ফিরছিল।

রিকশা থেকেই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল ধ্রুব।

—যাই বলো, রঙটা কিন্তু চমৎকার ম্যাচ করে করেছে। জগন্নাথবাবু ভদ্রলোকের রুচি আছে।

প্রীতি বললে, তুমি তো প্রথমে আপত্তি করেছিলে, উনিই বললেন খুব ব্রাইট দেখাবে।

ধ্রুব বললে, তখন কি ছাই এ-সব বুঝতাম। এখন আমি নিজেই কন্ট্রাক্টর হয়ে যেতে পারি, সব জেনে গেছি।

প্রীতি হেসে ফেললো। —তা হলে সেই কাজই শুরু করে দাও।

তারপর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে, যাই বলো, আমাদের বাড়িটাই বেস্ট, এ পাড়ায়।

ধ্রুবরও সে-রকমই মনে হচ্ছিল। আশেপাশে কয়েকটা বেশ বড়োসড়ো বাড়িও আছে, কিন্তু সেগুলোকে এখন আর তেমন সুন্দর লাগছে না। হয়তো অনেককাল বাইরেটা রঙ করেনি বলে, রোদে-জলে কেমন মরামরা লাগে। দু'-একটা বাড়ির রঙ নতুন, কিন্তু কোন রুচি নেই। নীল কিংবা সবুজ ঢেলে দিয়েছে।

প্রীতি একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললে। —হরিবল্, এই রকম ব্লু কেউ দেয়!

ধ্রুব গম্ভীরভাবে বললে, ওটা সুধীনবাবুর বাড়ি, চমৎকার লোক। এমন ভদ্র আর মিশুকে, কোন গর্ব নেই...

প্রীতি আর কিছু বললো না।

এ-পাড়ায় উঠে এসেই ধ্রুব অনেকের সঙ্গে আলাপ করে ফেলেছে। প্রীতির এখনও চেনাজানার গণ্ডি তেমন বাড়েনি। কে কেমন লোক ও কিছুই জানে না।

জানার দরকারও নেই। বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে বেতের চেয়ারে এলিয়ে বসে সিনেমার ম্যাগাজিনের পাতায় ডুব দিয়ে ওর অবসর কেটে যায়।

প্রীতির নিজেকে বেশ সুখী মনে হয়। ধ্রুবরও। যেন জীবনের কাছে সব চাওয়া ফুরিয়ে গেছে। এই বয়েসেই। এখন শুধু টিপুকে মানুষ করে তোলা। ও তো আপনা থেকেই হবে। শুধু একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করে দিলেই হবে।

এর মধ্যে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে সেই হাত-কাটা দালালটা একদিন এসে

হাজির। —কিছু ঠিক করলেন স্যার, ভাল পার্টি আছে, অবাঙালী চান অবাঙালী, বাঙালী চান বাঙালী…

ধ্রুব তাকে ফিরিয়ে দিল। —এখন নয়, এখন নয়।

আরো দু'চারজন এসেছে, আপনা থেকেই। বিব্রত, বিরক্তবোধ করেছে ধ্রুব। নীচের তলাটা খালি পড়ে থাকাও যেন এক অশান্তি।

—শালা ভাড়াটেদের জ্বালায় টেকা দায়।

একজনের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ধ্রুব বললে।

প্রীতিও সমান বিরক্ত। বললে, সামনে লিখে দাও, ভাড়া দেওয়া হবে না।

ধ্রুব হাসলো। —তা হলে তো আরও বিরক্ত করবে। সবাই জেনে যাবে নীচের তলা খালি আছে।

আসলে ধ্রুব এখনও মনস্থির করতে পারছে না, ভাড়া দেবে কিনা। ভাড়া না দিয়ে যদি ধার দেনা শোধ হয়ে যায়! না, ওর কেবলই ভয়, হয়তো ঠকে যাবে। হয়তো আরো ভাড়া বাড়বে, তখন ভাড়াটে তুলতে পারবে না।

ভাড়াটেকে তোলা এ-বাজারে যে কঠিন কাজ, ধ্রুব জানে। ওর মত সকলেই তো আর বাড়ি করে উঠে আসতে পারে না। তাই সব অত্যাচার সয়েও দাঁত কামড়ে পড়ে থাকে। উঠে আসতে কি আর পারে না, চেষ্টাই করে না। ধ্রুবর তো এখন তাই মনে হয়। ও পারলো কি করে।

অফিসে অবিনাশ তো ঠাট্টা করে ওকে মূর্খ বললো। ভাড়ার ফ্ল্যাট এমনি এমনি ছেড়ে দিয়েছে শুনে বলে উঠলো, তুমি তো একটি মূর্খ হে। এমনি কখনো ছাড়ে? জানো, পঞ্চাশ হাজার দিলেও ভাড়াটে ওঠে না। আদায় করে নিতে হত।

ধ্রুব হেসেছিল ওর কথা শুনে।

অবিনাশ বলেছে, হাসির কি আছে? এটা তোমার রাইট। ও লোকটা আইনের জোরে বাড়িওয়ালা, তুমি আইনের জোরে ভাড়াটে। যখন ভাড়া দিয়েছিল তখন তো ও অনেক দেখেশুনে দিয়েছে। কার বেশি দরকার তা তো দেখেনি, যে ভাড়া বেশি দেবে, ভাড়া ঠিক ঠিক দিতে পারবে তাকেই দিয়েছে। সবাই তাই দেয়। স্বার্থ দেখে। তা হলে ভাড়াটেই বা স্বার্থ দেখবে না কেন?

শুনে সমস্ত মন তেতো হয়ে গিয়েছিল। অবিনাশের কাছে এই কথাগুলো শুনে ধ্রুব রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে। ও যদি ভাড়া দেয়, ভাড়াটেকে তুলতে চাইলে সেও এ-রকম টাকা চেয়ে বসবে হয়তো। অথচ ভিতরে ভিতরে একটা লোভ। ভাড়া দিলে তাড়াতাড়ি ধারদেনা শোধ করে দেওয়া যাবে।

এখন ধ্রুবর কাছেও ভাড়াটেরা একটা আতঙ্ক।

আসা-যাওয়ার পথে পাড়ার সুখেনবাবুর সঙ্গে আলাপ। মাঝে মাঝেই দেখা হত, আর ভদ্রলোক টানাটানি করতেন, আসুন, চা খেয়ে যান। কিংবা স্ত্রীকে নিয়ে একদিন আসুন।

ভদ্রলোকের পোশাক পরিচ্ছদ দেখে, হাঁটা-চলা দেখে ধারণা হয়েছিল উনিই বাড়িটার মালিক। তা নয়, ভাল চাকরি করেন। অনেক টাকা ভাড়া দিয়ে আছেন।

একদিন স-পরিবারে এলেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী খুব জমিয়ে গল্প করতে পারেন। যতক্ষণ ছিলেন সময় যে কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারেনি ওরা।

যাবার সময় বললেন, নিজে বাড়ি করেছেন, অনেক শান্তিতে আছেন। আমাদের যা বাড়িওয়ালা মশাই, ছবি টাঙাবো বলে দেয়ালে একটা পেরেক ঠুকছি, গুণ্ডামত ছেলেটা ছুটে এসে সে কি হম্বিতম্বি।

সুখেনবাবুর স্ত্রী বললেন, ছোটলোক, ছোটলোক।

চলে গেলেন ওঁরা, কিন্তু ধ্রুবর সমস্ত মন বিস্বাদ করে দিয়ে।

ধ্রুবর তো এই দু' মাসের মধ্যেই বাড়িটার ওপর মায়া পড়ে গেছে। মনে হচ্ছে এর চেয়ে ভাল জায়গা ভাল বাড়ি যেন হতে পারতো না।

দরজার ঝকঝকে নব্ দু'বেলা ঘষেমেজে চকচকে করে রাখে প্রীতি।

বলছিল, জিনিস রাখার জন্যে রান্নাঘরে কয়েকটা কাঠের খোপ বানিয়ে নেবে।

—আর হ্যাঁ, বসার ঘরের জন্যে বেশ বড় একটা ছবি। কোন মডার্ন আর্টিস্টের। প্রীতি বলেছিল, বসার ঘরে কোন অরিজিনাল পেণ্টিং না থাকলে ড্রয়িং রুম বলে মনেই হয় না।

ধ্রুবর মডার্ন আর্ট অত পছন্দ নয়। বলেছিল, যামিনী রায়।

প্রীতি উল্লসিত। —তা হলে তো কথাই নেই, কিন্তু অরিজিন্যাল!

এখনও ওদের বাড়িটাকে ঘিরে নানা স্বপ্ন। যেমন টিপুকে ঘিরে। বাড়িটাও যেন আরেকজন টিপু। আসলে এও তো রক্তমাংস দিয়েই গড়া। শেষে কি একজন ভাড়াটে এসে দুম দুম করে এর দেয়াল খুঁড়তে আরম্ভ করবে নাকি। সে এক আতঙ্ক।

সুখেনবাবুর কথাটা মনে পড়ে গেল। বললে, ভাড়াটে, তার আবার ছবি টাঙানোর শখ।

ওর স্বগতোক্তি প্রীতির কানে গেল। —আগের ফ্ল্যাটে আমরাও তো টাঙিয়েছিলাম। তুমি না, কেমন যেন বদলে যাচ্ছো।

ধ্রুব বললে, বদলে যাচ্ছি না, বদলে গিয়েছি। এখন আমি সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তখন পেতাম না।

প্রীতি ভুরু কুঁচকে তাকালো ধ্রুবর চোখের দিকে। —তুমি কি যেন হয়ে যাচ্ছো।

ধ্রুব চুপ করে গেল। ও কি সত্যি সত্যি বদলে যাচ্ছে নাকি?

তা না হলে ও সুখেনবাবুকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চাইলো কেন? ওঁরা তো নিজে থেকেই একদিন আলাপ করতে এসেছিলেন। ধ্রুব কথা দিয়েছিল, ওরাও একদিন যাবে।

কিন্তু গেল না।

প্রীতি একদিন বলেছিল। ধ্রুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছে, না না, অত মেলামেশার কি দরকার।

একটু পরে বলেছে, জীবনবাবুকে চটিয়ে কি লাভ।

জীবনবাবু অর্থাৎ সুখেনবাবুর বাড়িওয়ালা। লোকটিকে ভালই লাগে ধ্রুবর। খুব খোলামেলা। কথাবার্তায় কোন রাখাঢাকা নেই।

এখানে এসে ও ভেবেছিল সকলের খুব বন্ধু হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম বোধহয় চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু পারেনি। কেন, কে জানে।

ওর নিজেরই দোষ কিনা জানে না।

এখন প্রীতিও বলছে, তুমি না, কেমন যেন বদলে যাচ্ছো!

ধ্রুব মনে মনে বললে, বদলে যেতেই তো চাই। আমি তো বাড়ি বদল করেছি। বাড়ি বদল মানে তো শুধু একটা বাড়ি থেকে আরেকটা বাড়িতে যাওয়া নয়।

এসে একদিন প্রীতিকে বললে, চলো অরিন্দমবাবুদের বাড়ি যেতে

হবে। উনি আজ আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন।

প্রীতি অবাক হয়ে বললে, অরিন্দমবাবু, সে আবার কে ?

—বাঃ, তোমাকে তো কতদিন বলেছি, প্রায়ই দেখা হয়। নামগুলো তো মনে রাখবে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, ঐ তিনতলা বড় বাড়ি, ওঁরই। বলেছেন, ওঁর কর্পোরেশনে চেনা আছে, বাড়ির ট্যাক্সটা যাতে কম হয় ব্যবস্থা করে দেবেন।

প্রীতি শুধু বললে, ও।

গেল। কিন্তু খুব মন খুলে আলাপ করলো না। বোধহয় ভদ্রলোকের গিন্নীকে পছন্দ হয়নি। পছন্দ হবার কথাও নয়। বেশ বয়স্ক, জবুথবু। একটু প্রাচীনপন্থী।

অরিন্দমবাবুকেও ধ্রুবর খুব ভাল লাগেনি। কেবল ঘরের মোজেক দেখাচ্ছিলেন। কি রকম পালিশ দেখেছেন ? ডিজাইনটা আর কোথাও দেখবেন না। বারান্দার গ্রীল দেখাচ্ছিলেন।

তবু বন্ধু মনে হল তাঁকে। অরিন্দমবাবু বললেন, ট্যাক্স নিয়ে আপনি ভাববেন না, আমার লোক আছে। এই গোটা বাড়ির কত ট্যাক্স করিয়েছি জানেন, মাত্র একশো কুড়ি।

বলে হো হো করে হাসলেন।

ফেরার সময় ধ্রুব বলেছিল, যাই বলো, ভদ্রলোক খুব পরোপকারী। যেচে কে এই উপকার করে আজকের বাজারে।

পরোপকারী কথাটা নিজের কানেই খট্ করে লাগলো। পরের উপকার ? কিন্তু অরিন্দমবাবু কি ধ্রুবকে পর ভাবছেন ? নাকি ধ্রুবই ওঁকে পর ভাবছে। কেমন যেন আপন আপন মনে হচ্ছে। শুধু স্বার্থের জন্যে ? না কি স্বার্থই ওদের এক করে দিয়েছে, আপন করে দিয়েছে।

হয়তো তাই।

সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি। রাস্তায় রাস্তায় জল জমে গেছে। অফিস থেকে বেরিয়ে ভেবেছিল ট্যাক্সি করেই বাড়ি ফিরবে। কিন্তু পকেটে টাকাও বেশি ছিল না। আজকাল খরচ কমানোর চেষ্টা করছে, সেজন্যেই পকেটে টাকাও বেশি রাখে না। থাকলেই খরচ হয়ে যায়। ভয় হল, জ্যামে আটকে গিয়ে মীটার কোথায় উঠবে কে জানে। শেষে বাড়ি পর্যন্ত যদি না আসে,

মাঝপথে টাকা দিতে পারবে না।

দু' দুবার বাস বদলাতে গিয়ে একেবারে কাকভেজা।

বাড়ি ফিরেই শুনতে পেল প্রচণ্ড উল্লাস। হাসিহল্লা।

বেল্ বাজানোর পর এসে দরজা খুলতেও দেরি করলো প্রীতি। কিংবা একে ক্লান্ত তার ওপর ভিজে গেছে বলেই ধ্রুবর মনে হল দরজা খুলতে বড় বেশি দেরি করছে প্রীতি।

রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করলো।

কিন্তু ঢুকেই চক্ষুস্থির। জামাকাপড় বদলানোর জন্যে বসার ঘরে এসে অপেক্ষা করলো। প্রীতি শুকনো জামাকাপড় এনে দিয়ে গেল।

এক ঝলক দেখেছে, তাতেই বিরক্তি। সুখেনবাবুর স্ত্রী।

ওঁরই সঙ্গে এত হাসিগল্প। এত হল্লা। দুড়ুমদাড়াম করে দেয়াল খুঁড়ছিল বলে জীবনবাবু একটু আপত্তি করেছেন, তাঁরই তো বাড়ি, মায়া হবে না! তার জন্যে বাড়ি বয়ে বলতে এসেছিলেন এই সুখেনবাবুরা।

উদ্দেশ্য তো একটাই। অরিন্দমবাবুর বিরুদ্ধে পাড়ায় প্রোপাগাণ্ডা করা।

অনেকক্ষণ ধরে বসার ঘরে বসে বসে রাগ চাপছিল ধ্রুব। ভদ্রমহিলার যাবার নাম নেই।

শেষে শুনতে পেল, ভদ্রমহিলা বলছেন, ছাতাই দাও ভাই, চলে যাই। কতক্ষণ আর উনি বসে থাকবেন।

এ-কথাটা যেন আগে বলা যেত না।

উনি চলে যেতেই রাগে ফেটে পড়লো ধ্রুব।

—বার বার বলেছি, ওদের সঙ্গে মেলামেশা করো না, করো না।

প্রীতি অবাক হয়ে বললো, কেন, কি করলো ওরা? বরং আমি একা একা থাকি, উনি এলেন বলে তো...

ধ্রুব গলার স্বর তুললো। —মেলামেশার আরো তো লোক আছে। এখন তো খুব হাসাহাসি, নীচের তলায় যদি ভাড়াটে বসাই, তখন দেখবে তার সঙ্গে দল বাঁধছে। সব চেনা আছে আমার।

প্রীতি বিভ্রান্তের মত তাকিয়ে রইলো ধ্রুবর চোখের দিকে।

ধ্রুব তখনও ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছে।

বললে, ওরা তো শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখে। গল্প বলতে তো,

বাড়িওয়ালা মাথার ওপর শিলনোড়ায় মশলা বাটে, বললেও শোনে না। কিংবা এই সেদিন এসেছি, এর মধ্যে ভাড়া বাড়াতে বলছে। আর নয়তো ঐ এক কথা, জল দেয় না। ওরা একটা আলাদা ক্লাশ, বুঝলে!

প্রীতি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ধ্রুবর চোখের দিকে। তারপর কেমন একটা রহস্যের হাসি হাসলো।

আর ধীরে ধীরে বললে, বাড়িটা সত্যি বদলে গেছে।

